সম্পূর্ণ উপন্যাস

ঘোরপ্যাঁচে প্রাণগোবিন্দ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছবি: দেবাশিস দেব

"নমস্কার প্রাণগোবিন্দবাবু। এই অধমের নাম প্রভঞ্জন সূত্রধর। সেই ময়না-মুগবেড়ে থেকে আসছি।" প্রাণগোবিন্দবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, "তা আসুন, আসুন।"

শীতকালের সকাল সাতটা। ভোরবেলা জম্পেশ কুয়াশা ছিল, এখন কুয়াশা কেটে দক্ষিণের বারান্দায় নরম রোদ এসে পড়েছে। সামনে একটু ছোট

বাগানমতো। তাতে শীতকালের গাঁদা, পপি, মোরগ ফুল ফুটে আছে। পোকামাকড়রাও যে যার কাজে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাগানে ওড়াওড়ি করছে। প্রাণগোবিন্দর কুকুর নেই, দু'টো নধর বিড়াল আছে। তারা দু'জন প্রাণগোবিন্দর পায়ের কাছে দিব্যি বসে আলসেমি করছে। এ সময় প্রাণগোবিন্দবাবু চা খান। চায়ের সঙ্গে নোনতা বিস্কুট থাকে। গাঁয়ে খবরের কাগজ আসতে বেশ দেরি হয়। কাগজ আসেনি বলে প্রাণগোবিন্দ বসে-বসে পঞ্জিকা পড়ছিলেন। পঞ্জিকা তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থ। সারা বছর তিনি ফাঁক পেলেই পঞ্জিকা পড়েন। আর পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে জাদু রুমাল বা অত্যাশ্চর্য আতর বা অতি বৃহৎ লাল মুলার কথা ভেবে খুবই অবাক হন। প্রাণগোবিন্দবাবু অবাক হতে খুবই ভালবাসেন।

প্রভঞ্জন সূত্রধর মধ্যবয়সি। মোটাসোটা মানুষ। গায়ের রং কালোর দিকেই। বাবরি চুল, ভুঁড়ো গোঁফ আর লম্বা জুলপি আছে। পায়ে কেড্‌স আর ফুল মোজা, পরনে খাটো করে পরা ধুতি আর গায়ে একটা সাদা শার্টের উপর কালো আর কুটকুটে চেহারার কোট। বারান্দায় উঠে প্রভঞ্জন একটা বেতের চেয়ার টেনে প্রাণগোবিন্দবাবুর মুখোমুখি বসে বললেন, "বিচক্ষণ মানুষ দেখলে আমি বড় খুশি হই। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, আজকাল বিচক্ষণ মানুষ বিশেষ দেখাই যায় না।"

প্রাণগোবিন্দ কথাটা শুনে খুশিই হলেন। কারণ, তাঁর পরিবারের কেউই তাঁকে বিচক্ষণ বলে মনে করে না। এমনকী, তাঁর সন্দেহ, তাঁর

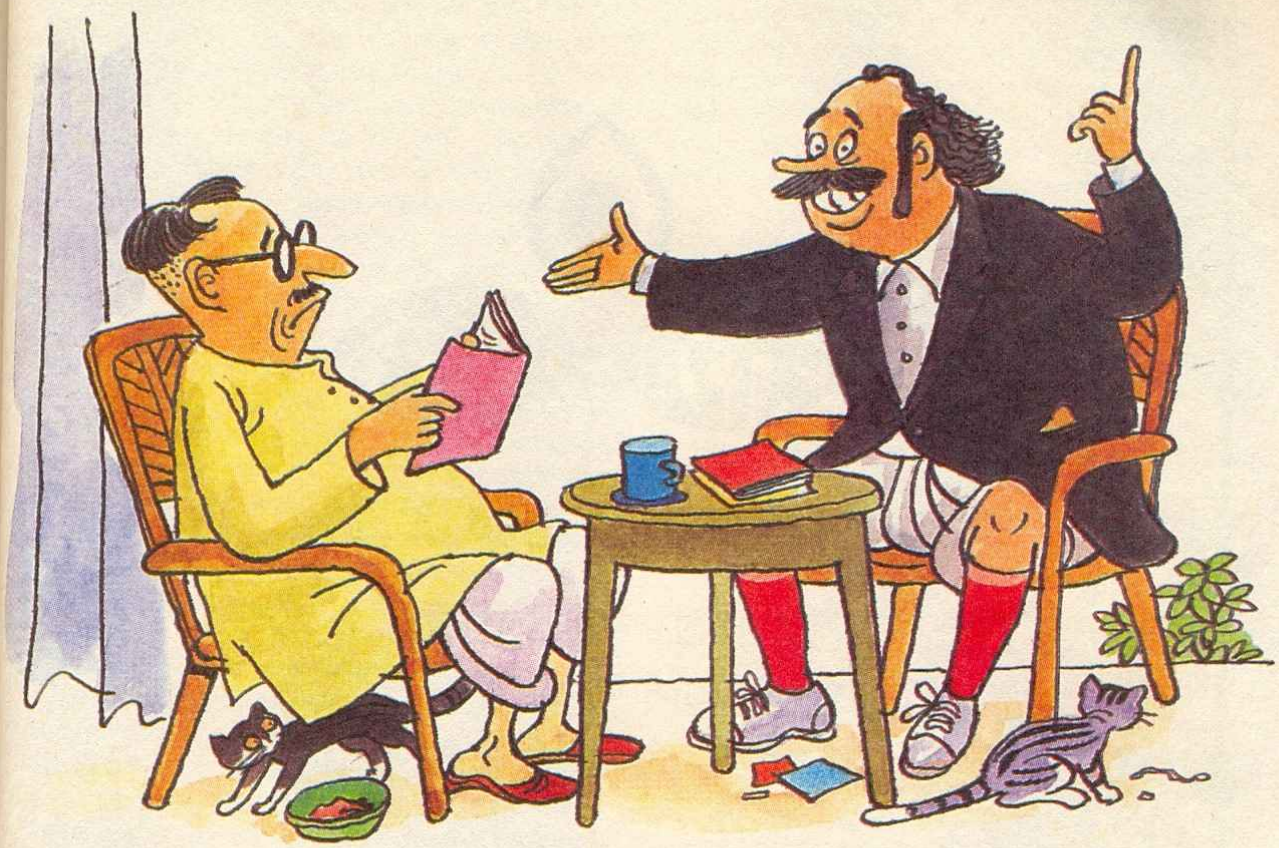

পোষা দু'টো বিড়ালেরও প্রাণগোবিন্দর বুদ্ধিশুদ্ধির উপর বিশেষ আস্থা নেই। তিনি একটু খুশির হাসি হেসে বললেন, "তা তো বটেই। কিন্তু বিচক্ষণ লোকগুলো কোথায় গেল বলুন তো!"

"আহা, যাবে আর কোথায়? যাওয়ার আগে তো আসাটা দরকার। তাই না? না এলে যাবেই বা কী করে? কথাটা বুঝলেন না? আসলে বিচক্ষণ মানুষ আজকাল আর জন্মাচ্ছেই না। সাতটা গ্রাম ঘুরে হয়তো এক-আধজন পাবেন।"

প্রাণগোবিন্দবাবু এ কথাতেও বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে বললেন, "তা বটে। বিচক্ষণ মানুষের বেশ অভাবই দেখছি। তা একটু চা খাবেন নাকি?"

প্রভঞ্জন মাথা নেড়ে বললেন, "না মশাই, এখন চা খেয়ে আর খিদেটা নষ্ট করব না। বরং একেবারে জলখাবারের সঙ্গেই চা খাওয়া যাবে।"

প্রাণগোবিন্দর মুখটা একটু শুকিয়ে গেল। কারণ হল, গাঁয়ে এসে বসবাস শুরু করার পর প্রায়ই গাঁয়ের মাতব্বর আর উটকো লোকেরা এসে জুটছে। তাদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে প্রাণগোবিন্দর গিন্নি জেরবার। আর লোকেরাও যেন তক্কেতক্কে থাকে। সকাল-বিকেলে প্রাণগোবিন্দের চা বা জলখাবারের সময়ই 'হেঁঃ হেঁঃ' করতে-করতে এসে হাজির হয়। প্রাণগোবিন্দর গিন্নির ধারণা হয়েছে যে, গাঁয়ের লোকগুলো খুবই ছোঁচা এবং বেহায়া। তাই তিনি এখন কড়া হাতে অতিথি-আপ্যায়ন বন্ধ করেছেন। এক-আধ কাপ চায়ে তেমন আপত্তি করেন না, কিন্তু খাবারের প্লেট সাজিয়ে দেওয়ার পাট তুলে দিয়েছেন।

তাই প্রাণগোবিন্দবাবু কাঁচুমাচু হয়ে মাথাটাথা চুলকে খুব লজ্জিত মুখে বললেন, "ব্যাপারটা কী জানেন, আমি আজকাল জলখাবারটাবার খাই না। ওই কী বলে, একটু ডায়েট কন্ট্রোল করছি আরকী!"

প্রভঞ্জন সূত্রধর এ কথায় একটুও দমে গেলেন না। বরং বেশ প্রসন্ন মুখেই বললেন, "এই তো বিচক্ষণ লোকের লক্ষণ। মিতাহার মিতাচার

পুজোর দিন খুশীর দিন...
পুজোর দিন আনন্দের,
পুজোর দিন সবার দিন...
পুজোর দিন পছন্দের

Mam's Diva
FORUM Shopping Mall
SHOP No. : 216•10/3 ELGIN ROAD

Mam's
FOOTWEAR
14F, Lindsay Street

না থাকলে কি বুদ্ধি বিবেচনা খোলে? পেট ভার হলে বুদ্ধি নিম্নগামী হয়। প্রাতরাশের দরকারও নেই তেমন। একটু আগে ঘোষপাড়ায় সাতকড়ির বাড়িতে দই-চিঁড়ে, মর্তমান কলা আর পাটালি গুড় দিয়ে ফলার করে এসেছি। বরং একটু বসে কথাবার্তা কই। তারপর একেবারে মধ্যাহ্নভোজনটাই সারা যাবে, কী বলেন?"

মধ্যাহ্নভোজন শুনে প্রাণগোবিন্দবাবুর প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম। স্খলিত হাত থেকে পঞ্জিকাখানা খসে পড়ে গেল। প্রভঞ্জন তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে পঞ্জিকাখানা তুলে ধুলো ঝেড়ে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "ওই সাতকড়ির কথাই ধরুন। দিব্যি চোখা-চালাক বিচক্ষণ মানুষ ছিল। বিষয়-সম্পত্তিও করেছে মেলা। কিন্তু এই মাঝবয়সে হঠাৎ নোলা হয়েছে খুব। কেবল খাই-খাই ভাব। সারাদিন কলাটা-মুলোটা তো খাচ্ছেই, তার উপর সকালে চিঁড়ে-দই সাপটে দুপুরে কালিয়া-কোর্মা উড়িয়ে রাতে ফের পোলাও-পায়েস। এখন দেখবেন বেশি খেয়ে-খেয়ে দিন-দিন কেমন ভ্যাবা-গঙ্গারাম হয়ে যাচ্ছে। পেটকে যত বিশ্রাম দেবেন, মাথা তত খোলতাই হবে।"

প্রাণগোবিন্দ জলখাবারের ব্যাপারটা পাশ কাটানোর পর এখন এই মধ্যাহ্নভোজনটা কী করে এড়ানো যায়, সেটা দ্রুত ভাবতে-ভাবতে বললেন, "তা বটে, তা বটে। বেশি খাওয়া মোটেই ঠিক নয় মশাই। এই তো আজকেই সেই নন্দীগ্রামে আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের নেমন্তন্ন। তা তারা বেশ ফলাও আয়োজনও করে রেখেছে। কিন্তু আমি সাফ বলে দিয়েছি, না বাপু, গুরুপাক চলবে না। স্রেফ মাছের ঝোল আর ভাত।"

প্রভঞ্জন যেন ভারী আহ্লাদিত হয়ে উঠলেন এ কথায়। বললেন, "আমি যত আপনার বিচক্ষণতার পরিচয় পাচ্ছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি। আপনি খুবই আটঘাট বেঁধে কাজ করেন। তবে এও বলি, যখন অন্যের পয়সাতেই ভোজ খাচ্ছেন, তখন একটু সেঁটে না খেলে কি জুত হবে? নন্দীগ্রাম তো আর এক দৌড়ের রাস্তা নয়। পাক্কা সাড়ে তিন ক্রোশ। পথের ধকলেই সব হজম হয়ে যাবে যে! তা সে যাক, আপনার নির্লোভ স্বভাব দেখে ভারী ভাল লাগল। তা হলে এবার কাজের কথাটা বলে ফেলি।"

প্রাণগোবিন্দ উৎসাহিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাজের কথাটাই হোক। আমাকে আবার সপরিবার বেলাবেলি সেই নন্দীগ্রামে রওনা হতে হবে তো!"

প্রভঞ্জন মাথা নেড়ে বললেন, "তা তো বটেই, তবে কিনা সকালবেলায় এতক্ষণ খালি পেটে থাকাটাও আপনার ঠিক হচ্ছে না। উপোস দেওয়ার ফলে আপনার বুদ্ধিতে শান পড়ছে বটে, কিন্তু মাথা ছাড়া অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এতে খুব-একটা খুশি হবে কি? তাদেরও তো কিছু প্রত্যাশা থাকে। নন্দীগ্রাম পৌঁছতে, তা ধরুন, বেলা একটা-দেড়টা তো হবেই। একটু বেশিই লাগতে পারে। মাঝখানে আবার সরস্বতী নদীর খেয়া পারের ব্যাপার আছে কিনা।"

প্রাণগোবিন্দ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। কারণ, ভিতরবাড়ি থেকে লুচি ভাজার গন্ধ আসছে, একটু আগে বেগুন ভাজার গন্ধও আসছিল। এখন যদি গিন্নি হুট করে মোক্ষদাকে দিয়ে লুচির থালা পাঠিয়ে দেন, তা হলে প্রভঞ্জনের সামনে ভারী লজ্জায় পড়তে হবে। তাই উদ্বেগের গলায় বললেন, "তা হলে বরং কিছু একটু মুখে দিয়ে নেবখন। এবার কাজের কথাটা...?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে!" বলে প্রভঞ্জন সূত্রধর তাঁর কোটের ভিতর দিককার কোনও গুপ্ত পকেটে বেশ গভীরে ডান হাতটা ঢুকিয়ে অতি সাবধানে এক বান্ডিল নোট বের করে এনে সামনের খুদে টেবিলটার উপর রেখে একগাল হেসে বললেন, "এই হল গৌরীর মুক্তিপণ। পুরো পঞ্চাশ হাজার আছে। গুনে নিন।"

প্রাণগোবিন্দ গোল-গোল চোখে অপার বিস্ময়ে নোটের বান্ডিলটা দেখছিলেন। পাঁচশো টাকার নোট তিনি ভালই চেনেন। না গুনেই আন্দাজ করা যায়, বান্ডিলে শতখানেক নোট আছেই। এই সাতসকালে অযাচিত এত টাকা তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হওয়ায় প্রথমে কিছুটা অবাক এবং কয়েক সেকেন্ড বাদে বেশ খুশি হয়ে বলে উঠলেন, "বাঃ বাঃ, এ তো বেশ মোটা টাকাই।"

প্রভঞ্জনও একমত হয়ে বললেন, "আজ্ঞে, আমারও তাই মত। আমার মক্কেল চরণডাঙার গোকুল বিশ্বাসকেও আমি কথাটা বলেছিলাম। বলেছিলাম, 'গোকুলবাবু, একটা গোরুর জন্য ফস করে পঞ্চাশ হাজার টাকা বের করে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? দরাদরি করে দশ-বিশ হাজার টাকা কমানোর চেষ্টা করলে হত না?' শুনে উনি আঁতকে উঠে বললেন, 'বলো কী প্রভঞ্জন! যারা আমার গৌরীকে নিয়ে গিয়েছে তারা কি আর ভাল লোক! দশ-বিশ হাজার কম দিলে তারা হয়তো গাঁইগুঁই করে রাজি হবে, কিন্তু শোধ তোলার জন্য গৌরীকে হয়তো পাঁচন দিয়ে ঘা-কতক বসিয়ে দেবে। কিংবা লেজ মুচড়ে দেবে বা কান মলে দেবে। ও বাবা, গৌরীর কষ্ট আমার মোটেই সহ্য হবে না। সে আমার মেয়ের মতো। তার কষ্টের কাছে পঞ্চাশ হাজার কিছু নয়।'"

শুনে প্রাণগোবিন্দরও চোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, "আহা, গোরুকে তো বড় ভালবাসেন ভদ্রলোক!"

"খুব, খুব। পরিবারের আর কারও সঙ্গেই গোকুল বিশ্বাসের বনে না। শুধু এই গৌরীর সঙ্গেই তাঁর যত ভাব।"

"আহা, শুনে বড় ভাল লাগল। অবলা জীবের প্রতি মানুষের মায়া-মমতা যত বাড়ে, ততই পৃথিবীর মঙ্গল।"

"আজ্ঞে, সে কথাও ঠিক। আর সেই জন্যই গোকুল বিশ্বাস দরাদরি না করে পুরো মুক্তিপণের টাকাটাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। টাকাটা প্রকাশ্যে রাখাটা ঠিক হচ্ছে না মশাই। নোটগুলো পরীক্ষা করে গুনে নিন। তারপর একটু ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখুন।"

টাকা গুনতে খুব একটা খারাপ লাগে না প্রাণগোবিন্দবাবুর। সময়টাও ভালই কাটে। তিনি টাকাগুলো গুনে বললেন, "নোটগুলো জাল নয় এবং নোট একশোখানাই আছে।" টাকার বান্ডিলটা র‍্যাপারের তলায় ঢুকিয়ে ফেলে বললেন, "নাঃ, পঞ্চাশ হাজারই আছে।"

প্রভঞ্জন মাথা নেড়ে বললেন, "তা আর থাকবে না? গোকুল বিশ্বাস খাঁটি লোক, কথার নড়চড় নেই। তা হলে বরং গোরুটা আনতে বলে দিন। আমাকে গোরু নিয়ে গোকুল বিশ্বাসের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তবে বিষয়কর্মে বেরোতে হবে। সেই রকমই কথা হয়ে আছে কিনা।"

প্রাণগোবিন্দ এবার একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন। যতদূর মনে পড়ছে, তাঁদের মোটে দুটো গোরু আছে। একটা কালো আর একটা বাদামি, একটা দুধেল, একটা গাভিন। গোরু বিষয়ে তাঁর জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। ওসব তাঁর গিন্নি আর কাজের লোকেরাই সামলায়। গোরুর দাম পঞ্চাশ হাজার কিনা এ বিষয়েও তিনি খুব নিশ্চিত নন।

ঠিক এই সময় মোক্ষদা পরদা সরিয়ে লুচি আর বেগুন ভাজার রেকাবিটা নিয়ে বারান্দায় প্রবেশ করায় প্রাণগোবিন্দের মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া খেলে গেল। তিনি ভারী আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, "নিন, আপনার জলখাবার এসে গিয়েছে।"

প্রভঞ্জন ভারী খুশি হয়ে বললেন, "তাই নাকি? বাঃ, বেশ!" বলেই মোক্ষদার হাত থেকে একরকম রেকাবিটা কেড়েই নিলেন।

প্রাণগোবিন্দ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, "আপনি বরং খেতে থাকুন, আমি গোরুর ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে আসছি।"

"যে আজ্ঞে। গোরু না নিয়ে যাচ্ছি না। আপনি ঘুরে আসুন।"

শশব্যস্তে ভিতরবাড়িতে এসে প্রাণগোবিন্দ তাঁর গিন্নি সুরবালাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের কোন গোরুটার নাম গৌরী বলো তো?"

সুরবালা কুটনো কুটতে বসেছেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, "গৌরী! গৌরী তো আমাদের বড় মেয়ের নাম। ও নাম গোরুকে দিতে যাব কেন?"

"আহা, গৌরী নামে কি আমাদের কোনও গোরু নেই! ওই যে গো, যে গোরুটাকে চরণডাঙার গোকুল বিশ্বাস খুব ভালবাসে!"

"তোমার কি বুড়ো বয়সে মাথার দোষ হল? কে চরণডাঙার গোকুল বিশ্বাস? সে আমাদের গোরুকে ভালবাসতে যাবে কোন

দুঃখে?"

"আহা, ওসব তুমি বুঝবে না। আমাদের গোরুগুলোর নাম কী সেটা আগে শুনি!"

"একটার নাম রাঙি, আর-একটার নাম কালী। তুমি কেমন লোক বাপু যে, নিজের গোরুর নাম জানো না!"

ঠিক এই সময় মোক্ষদা এসে চোখ বড়-বড় করে বলল, "কর্তামা, দ্যাখোগে, একটা ভালুকের মতো লোক এসে কর্তাবাবার জলখাবারের প্লেট কেড়ে নিয়ে গবগব করে লুচি-বেগুন ভাজা খাচ্ছে। আরও চাইছে।"

"অ্যাঁ!" বলে একটা আর্তনাদ করে বঁটি কাত করে রেখে সুরবালা তেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জোঁকের মুখে নুন ফেলার কায়দায় প্রাণগোবিন্দ ফস করে র‍্যাপারের তলা থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করে গিন্নির নাকের ডগায় ধরে একগাল হেসে বললেন, "বিনি মাগনা খাচ্ছে না গো, বিনি মাগনা খাচ্ছে না, নগদ পঞ্চাশ হাজারটি টাকা গুনে দিয়েছেন!"

সুরবালা হাঁ করে কিছুক্ষণ প্রাণগোবিন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "লুচি-বেগুন ভাজার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা! তুমি কী সব আবোলতাবোল বকছ বলো তো! এর চেয়ে তো কাবলিওয়ালার ভাষা বোঝা সহজ। কী হয়েছে, একটু গুছিয়ে বলবে?"

প্রাণগোবিন্দর নিজেরও কেমন যেন একটু ধন্দ লাগছে। তিনি ঠিক ব্যাপারগুলো মেলাতে পারছেন না। তাই আমতা-আমতা করে বললেন, "আসলে একজন লোক আমাদের একটা গোরু কিনতে চায়। সে নাকি গোরুটাকে খুব ভালবাসে। তাই পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

সুরবালা আরও হাঁ! অনেকক্ষণ বাক্যিই বের করতে পারলেন না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "গোরুর দাম পঞ্চাশ হাজার? ওতে তো হাতি কেনা যায়। কোন চক্করে পড়েছ বলো তো! সাতসকালে গোরু কিনতেই বা লোক এসেছে কেন? আমরা কি গোরু বেচব বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছি! তোমার মতো আহাম্মককে নিয়ে চলা যে কী ঝঞ্ঝাটের কাজ, তা কেবল আমিই জানি। চলো দেখি, কোন মুখপোড়া এসে তোমাকে আগড়মবাগড়ম বোঝাচ্ছে!"

সুরবালা রাগে গরগর করতে-করতে বারান্দায় এসে দেখেন, একটা মোটাসোটা কোট-পরা লোক ভারী তারিয়ে-তারিয়ে শেষ লুচিটা দিয়ে শেষ বেগুন ভাজাটা বাগিয়ে ধরে খাচ্ছে। আরামে চোখ দু'টি নিমীলিত।

সুরবালা বললেন, "আচ্ছা, কী ব্যাপার বলুন তো! আপনি নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আমাদের একটা গোরু কিনতে চান?"

প্রভঞ্জন স্বপ্নাতুর চোখে সুরবালার দিকে চেয়ে খুব নির্বিকার গলায় বললেন, "মা ঠাকরোন, বাড়তি লুচি আছে কি?"

সুরবালা একটু অবাক হয়ে থতমত খেয়ে বললেন, "আছে। পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

আরও লুচি-বেগুন ভাজা এল। সঙ্গে সুরবালা আর প্রাণগোবিন্দও।

সুরবালা বললেন, "এবার আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন কি? উনি তো কিছুই গুছিয়ে বলতে পারছেন না। আমরা তো গোরু বেচতে চাই না!"

প্রভঞ্জন খেতে-খেতে বললেন, "বিকিকিনির কথা উঠছে কেন মা? গোরু আমার মক্কেলও কিনতে চান না। ওটা হল গোরুর মুক্তিপণ।"

"মুক্তিপণ! আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন, কিছুই যে বুঝতে পারছি না!"

প্রভঞ্জন হাত-মুখ গ্লাসের জলে ধুয়ে রুমালে মুখ মুছে ভারী তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "এ বাড়ির খাওয়াদাওয়া বেশ উঁচুদরের, কী বলেন মা? তা না হবেই বা কেন? রোজগারটাও উঁচু, নজরও উঁচু। ভারী খুশি হলাম। বিচক্ষণ মানুষ দেখলেই মনটা ভারী নেচে ওঠে। তা মা, কী যেন জানতে চাইছিলেন?"

"বলছি, ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"আহা, স্বয়ং প্রাণগোবিন্দবাবু থাকতে আমার কাছে শুনবেন কেন? উনিই ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। তবে মা, ওঁর মতো পরিষ্কার মাথা আর দূরদৃষ্টি আমি খুব বেশি দেখিনি।"

সুরবালা অবাক হয়ে বললেন, "ওঁর পরিষ্কার মাথা? দূরদৃষ্টি? বলি আপনার কি ভীমরতি হয়েছে? ওঁর তো ডান-বাঁ জ্ঞানই নেই। এই আহাম্মক মানুষকে নিয়ে জ্বলে-পুড়ে যে খাক হয়ে গেলুম।"

মৃদু হেসে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে প্রভঞ্জন বললেন, "তা হলে মা, বলতেই হবে যে, আপনি ঘর করেও ওঁকে ঠিক চিনতে পারেননি। বড় মাপের প্রতিভাবানদের চট করে চেনাও যায় না কিনা। যাঁকে আপনি আহাম্মক ভাবছেন, তিনি শুধু বিচক্ষণই নন, আটঘাট বেঁধে ঠান্ডা মাথায় এমন পরিপাটি আর নিখুঁত কাজ করেন, যা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই আমার মক্কেল গোকুল বিশ্বাসের ঘটনাটাই দেখুন না। দিনচারেক আগে তার আদরের গোরু গৌরী মাঠে চরতে গিয়ে উধাও হয়ে যায়। রাখাল ছেলেটা নাকি খোঁটা বেঁধে গাছতলায় ঘুমোচ্ছিল, কিছু টেরই পায়নি। গৌরী নিরুদ্দেশ হওয়ায় গোকুল বিশ্বাস সারা তল্লাট তোলপাড় করে তাকে খুঁজলেন। না পেয়ে রাত্রিবেলা কেঁদে-কেটে শয্যা নিলেন। রাত বারোটায় তাঁর জানালায় টোকা পড়ল। তিনি উঠে জানালা খুলে দেখেন, মুখে গামছা বাঁধা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। চাপা গলায় বলল, 'গৌরীকে যদি ফেরত চাও, তা হলে নসিগঞ্জের প্রাণগোবিন্দ রায়ের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পৌঁছে দাও। তিন দিন সময় দিচ্ছি।' ব্যস, ওটুকু বলেই লোকটা হাওয়া হয়ে গেল।"

সুরবালা এবং প্রাণগোবিন্দ একসঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠলেন, "সর্বনাশ!"

প্রভঞ্জন অবাক হয়ে বললেন, "আচ্ছা, আপনাদের সর্বনাশ হতে যাবে কেন? সর্বনাশ তো হল গোকুল বিশ্বাসের। তা এই ঘটনার পর গোকুল বিশ্বাস আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি হলুম গে তাঁর বাঁধা উকিল। গিয়ে দেখলুম, তিনি খুবই ভেঙে পড়েছেন।"

সুরবালা আর্তনাদ করে উঠলেন, "আপনারা পুলিশে গেলেন না কেন?"

প্রভঞ্জন মৃদু হেসে বললেন, "তাতে লাভ কী বলুন। ওই যে বললুম, বিচক্ষণ মানুষদের নিখুঁত পরিকল্পনা থাকে। প্রথম কথা হল, আমাদের পাঁচটা গ্রাম নিয়ে হল নয়নজোড় থানা। থানার বড়বাবু হলেন গিয়ে প্রাণগোবিন্দবাবুর সাক্ষাৎ ভাগনিজামাই। নিজের মামাশ্বশুরের নামে নালিশ কোন দারোগা সহ্য করবে বলুন? তার উপর কথা হল, প্রমাণ কোথায়? চিরকুট নেই, লিখিত-পড়িত কিছু চুক্তি হয়নি, যে লোকটা খবর দিতে এসেছিল, তার মুখ দেখতে পাওয়া যায়নি। তাই তো বলছি, এরকম বুদ্ধিমান মানুষের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।"

সুরবালা খুবই রেগে গিয়ে বললেন, "কার সম্পর্কে কী বলছেন তা জানেন? উনি আহাম্মক হতে পারেন, বোকাও আছেন একটু, কিন্তু জীবনে কখনও কোনও অসৎ কাজ করেননি। চিরকাল কলেজে সুনামের সঙ্গে পড়িয়েছেন। উনি সকলেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র।"

প্রভঞ্জন ঘনঘন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "জানি মা ঠাকরোন, সব জানি। ওঁর সম্পর্কে সব খোঁজখবর নিয়েই এসেছি কিনা। উনি কলেজে দর্শনশাস্ত্র পড়াতেন, ভুলো মনের মানুষ, অতি সজ্জন, এসব সবাই জানে। আমাদের কাছেও উনি খুবই শ্রদ্ধার পাত্র। রিটায়ার করার পর গাঁয়ে এসে নিজের পূর্বপুরুষদের ভিটেতে বসবাস করছেন এতেও আমরা গৌরবই বোধ করি। রিটায়ারের পর যে নিজের মাথাটিকে নানারকম উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় খাটিয়ে যাচ্ছেন, এতেও আমরা বড় খুশি হয়েছি।"

"শুনুন, আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। তা হলে আপনি নিজের চোখেই দেখে যান, উনি অন্য কারও গোরু ধরে এনেছেন কিনা! আমি আমাদের রাখাল হলধরকে ডাকছি।"

খবর পেয়ে হলধর তাড়াতাড়ি এসে হাজির হল।

"যাও তো হলধর, এই ভদ্রলোককে নিয়ে গিয়ে আমাদের গোয়ালঘরটা দেখিয়ে নিয়ে এসো। উনি নিজের চোখেই দেখুন, আমাদের গোয়ালে দু'টোর বেশি গোরু আছে কি না।"

হলধর একটু কাঁচুমাচু হয়ে ঘ্যাঁস-ঘ্যাঁস করে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে আমতা-আমতা করে বলল, "মা-ঠান, একটা বড় মুশকিল হয়েছে যে!"

"মুশকিল! মুশকিল আবার কী হল?"

"কাল রাতে যখন গোয়াল বন্ধ করি তখন দুটো গোরুই ছিল বটে। কিন্তু আজ সকালে গোয়াল পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি, কোথা থেকে একটা তিন নম্বর গোরু এসে গোয়ালে ঢুকে বসে-বসে জাবর কাটছে!"

প্রভঞ্জন সোৎসাহে বলে উঠলেন, "দুধের মতো সাদা ধবধবে গাই তো, বাঁ দিকের দাবনায় একটা ত্রিশূলের মতো ছোপ আছে!"

হলধর কাহিল মুখ করে বলল, "আজ্ঞে তাই বটে।"

প্রভঞ্জন খুব গ্যালগ্যালে হাসি হেসে সুরবালার দিকে চেয়ে বললেন, "বলেছিলুম কিনা মা ঠাকরোন, আপনার স্বামীর এলেম আপনি জানেন না, জানি এই আমরা বাইরের লোকেরা। উনি নমস্য ব্যক্তি মা, নমস্য ব্যক্তি, কী বুদ্ধি! কী মেধা! কী সাংগঠনিক শক্তি! কী সাহস! এমন সুন্দর সুচারুভাবে কাজ করলেন যে, ওঁর টিকিটিও কেউ ছুঁতে পারবে না। ছাত্র পড়াতেন, নিশ্চয়ই ভালই পড়াতেন। কিন্তু এই মেধা তো কেবল ছাত্রসমাজে আটকে রাখলে চলে না। এখন জনশিক্ষার কাজেও একে লাগাতে হবে। যাও তো বাপু হলধর, গোরুটা নিয়ে এসো। বেলাবেলি রওনা হয়ে পড়ি।"

সুরবালার মুখে কথা নেই। ধপ করে চেয়ারে বসে চোখ বুজে রইলেন। ভারী বেকুবের মতো নিজের মাথায় ঘনঘন হাত বুলিয়ে যাচ্ছিলেন প্রাণগোবিন্দ। ঘটনাটা ঠিক তাঁর মাথায় সেঁধোচ্ছে না এখনও।

॥ ২ ॥

নসিগঞ্জে আজ হাটবার। সরস্বতী নদীর ধারে বিশাল মাঠ জুড়ে হাটখোলা। ভোরবেলা থেকে ভ্যানগাড়ি, গো-গাড়ি, ম্যাটাডোর, নৌকোয় চেপে মাল আর ব্যাপারিরা এসে জড়ো হয়। হইহই ব্যাপার। নসিগঞ্জের হাট খুব বিখ্যাত। পাওয়া যায় না হেন জিনিস নেই। ভাল-মন্দ কিছু কিনতে হলে এই হাটবারের জন্য বসে থাকতে হয়।

হাটবারে ভারী আনন্দ হয় প্রাণগোবিন্দর। প্রথম কথা ভাল-মন্দ জিনিস কিনতে পারেন। গাঁয়ের পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হয়। আর শনিবার অর্থাৎ হাটের দিনই বিশমাইল দূরের মহকুমা শহর থেকে তাঁর খুদে দু'টো নাতি-নাতনি দাদু-ঠাকুরমার কাছে দু' দিনের জন্য বেড়াতে আসে। নাতনি পিউয়ের বয়স আট বছর, নাতি পিয়ালের পাঁচ। তাদের মা আর বাবা, অর্থাৎ প্রাণগোবিন্দর বউমা এবং ছেলে দু'জনেই সেখানকার হাসপাতালের ব্যস্ত ডাক্তার। বাচ্চা দু'টো তাই মা-বাবার সঙ্গ পায় না, আয়ার কাছে মানুষ হয়। কাজেই সপ্তাহের এই দু'টি ছুটির দিনে দাদু-ঠাকুরমার কাছে আসার জন্য তারা ছটফট করে। প্রাণগোবিন্দ আর সুরবালাও তাদের জন্য সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকেন।

অন্য শনিবারের মতোই আজও প্রাণগোবিন্দ হাটে বেরিয়েছেন। সঙ্গে ধামা আর ব্যাগট্যাগ নিয়ে হলধর। কিন্তু আজ প্রাণগোবিন্দর প্রাণে কোনও আনন্দ নেই। থাকার কথাও নয়। সকালবেলার অত্যাশ্চর্য ঘটনাটা এখনও তিনি পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারছেন না। প্রভঞ্জন সূত্রধর, গোকুল বিশ্বাস, গৌরী এইসব ব্যাপারগুলো ভারী তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। আরও দুশ্চিন্তা হল, পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিলটা নিয়ে। প্রভঞ্জনকে যাওয়ার সময় তিনি টাকাটা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। প্রভঞ্জন হাতজোড় করে বললেন, "ওটি পারব না। গোকুল বিশ্বাস একবার যাকে যা দেন, তা কস্মিনকালেও ফেরত নেন না। খুব নীতিবাগীশ মানুষ।"

প্রভঞ্জন চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ চোখ বুজে ঘাড় এলিয়ে চেয়ারে বসেছিলেন সুরবালা। একটাও কথা কননি প্রাণগোবিন্দর সঙ্গে। সুরবালা মূর্ছা গিয়েছেন কিনা তাও বুঝতে পারছিলেন না প্রাণগোবিন্দ। নিজেই যে কেন মূর্ছা যাননি তাও অবাক হয়ে ভাবছিলেন। হঠাৎ সুরবালা চোখ খুলে তাঁর দিকে চেয়ে খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, কোন পাপে আমার একজন গোরুচোরের সঙ্গে বিয়ে হল, তা বলতে পার?"

প্রাণগোবিন্দর কানটান অপমানে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

সুরবালা গলা আরও এক পরদা নামিয়ে বললেন, "মানুষকে চেনা যে কী কঠিন, তা আজ ভাল করে বুঝলাম।" বলে শান্তভাবেই উঠে ভিতরে চলে গেলেন।

মরমে মরে গিয়ে প্রাণগোবিন্দ উঠে ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে রইলেন। শরীরটা বড্ড কাহিল লাগছে। বিছানার পাশেই জানালা। জানালার ওপাশে বারান্দায় বসে ঠিকে কাজের মেয়ে লক্ষ্মী বাটনা বাটছিল। মোক্ষদা এসে তাকে চাপা গলায় বলল, "ওলো লক্ষ্মী, কর্তাবাবুর কীর্তির কথা শুনেছিস তো!"

লক্ষ্মী আহ্লাদের গলায় বলল, "ও মা, তা আর শুনিনি। বড় ঘরের বড় কেচ্ছা কাকের মুখে রটে যায়। তবে ভাই, এ কথাও বলি, কর্তাবাবুর যে এত ক্ষ্যামতা তা কখনও বুঝতে পারিনি। দেখে তো মনে হয়, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। কিন্তু কী কেরদানিটাই না দেখালেন। ঘরে বসে লাখ টাকা কামাই! আমার কর্তাটি তো সারা রাত সিঁদকাঠি নিয়ে ঘুরে দশ-বিশ টাকার বেশি রোজগার করতে পারে না।"

"আর বলিসনি। আমার বাড়ির মানুষটি তো দু' বছর ধরে জেলে ঘানি ঘোরাচ্ছে। আর কর্তাবাবুকে দ্যাখ, এত বড় কাজটা করলেন, গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না।"

প্রাণগোবিন্দ রায় কানে হাত চাপা দিয়ে উঠে পড়লেন। এ তো আর সহ্য করা যাচ্ছে না! এসব হচ্ছেটা কী? তিনি জীবনেও কারও সাতে-পাঁচে থাকেননি। চিরকাল বইয়ে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দিলেন। অথচ এই বেশ পরিণত বয়সে কোথাকার কে এক প্রভঞ্জন সূত্রধর এসে তাঁকে একেবারে গোরুচোর বানিয়ে ছাড়ল! ঘটনাটা রটে গেলে যে কী বিষম কাণ্ড হবে, তা ভেবে তাঁর হাত-পা হিম হয়ে আসছিল। উত্তেজিতভাবে কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারি করলেন। হাত-পা নিশপিশ করছে।"

এমন সময় হলধর এসে ভারী বিনীতভাবে বলল, "কত্তাবাবু, গিন্নিমা তাড়াতাড়ি হাটে যেতে বললেন। এই যে ফর্দ।"

প্রাণগোবিন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক, হাটে গেলে হয়তো পাঁচটা মানুষ দেখে একটু ভাল লাগবে। তাই দেরি না করে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু হাটে ঢুকতে যেতেই বিপত্তি। বটতলায় হরকাকার সঙ্গে দেখা। বললেন, "কী হে প্রাণগোবিন্দ, মুখখানা আজ এত ব্যাজার কেন?"

প্রাণগোবিন্দ দুঃখের সঙ্গে বললেন, "মনটা ভাল নেই কাকা।"

"দ্যাখো কাণ্ড! মন ভাল নেই কেন হে! আজ তো তোমারই দিন! ওরে বাপু, ট্যাঁকে টাকা থাকলে মন ভাল না থেকে পারে? যাও তো, বেশ ভাল করে বাজার করো, ভাল-ভাল জিনিস কিনতে থাকো, দেখবে মন ভাল হয়ে যাবে। ফেরার সময় স্যাকরার দোকানে বরং বউমার জন্য একটা গয়নার বায়না করে যেও।"

প্রাণগোবিন্দ সিঁটিয়ে গেলেন। সর্বনাশ! হরকাকাও শুনেছেন নাকি?

ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল যখন মাছওয়ালা হরিপদ বলল, "কর্তা, পাঁচশো টাকা কিলোর দেড় কিলো বাগদা চিংড়ি আজ আপনার জন্যই আলাদা করে রেখে দিয়েছি। আর কার ট্যাঁকের এত জোর আছে যে, ওই কুলীন মাছ কিনবে?"

প্রাণগোবিন্দর হাত-পা শিথিল হতে লাগল। মাথা ঝিমঝিম।

অপমানে, গ্লানিতে তাঁর ভিতরটা খাক হয়ে যাচ্ছে। চোখে জল আসছে, ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, গলা ধরে গিয়েছে। এভাবে কি বেঁচে থাকা যায়!

যাই হোক, কোনওক্রমে বাজারটা করলেন। তারপর হলধরকে দিয়ে বাজারের জিনিস রওনা করে দিয়ে বলে দিলেন, "আমার ফিরতে একটু দেরি হবে, বুঝলি! মিষ্টির দোকানটা ঘুরে যাচ্ছি।"

হলধর চলে যাওয়ার পর তিনি একটা দোকানে গিয়ে মজবুত দেখে নাইলনের দড়ি কিনলেন। দোকানদার অবশ্য বেশ হাসিমুখেই গদগদ হয়ে বলল, "একটু বেশি করেই নিয়ে যান না। অনেক গোরু বাঁধতে হবে তো!"

প্রাণগোবিন্দ কথাটায় তেমন কান দিলেন না। দড়ির গুছি র‍্যাপারের তলায় আড়াল করে নিয়ে তিনি হাট থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

ময়নার জঙ্গল মাইলদুই তফাতে। একটা জলাজমি পেরিয়ে তারপর জঙ্গল। সেখানে চিতাবাঘ এবং অজগর সাপ আছে বলে শুনেছেন প্রাণগোবিন্দ। জঙ্গলটার আরও কিছু বদনাম আছে। কিন্তু প্রাণগোবিন্দ মনস্থির করে ফেলেছেন, লোকালয় থেকে দূরে, সকলের চোখের আড়ালে আজ তিনি গলায় দড়ি দেবেন। এই বয়সে এই কলঙ্কের বোঝা বয়ে বেঁচে থাকার মানেই হয় না। তাঁর নিজের স্ত্রীই যখন তাঁকে বিশ্বাস করে না, তখন এই অসাড় জীবন রাখার কোনও মানেই হয় না।

শীতকাল বলে হাঁটাহাঁটিতে তেমন কষ্টও হল না। দু' মাইল রাস্তা পেরোতে মিনিটচল্লিশ লাগল। জলাটা শীতকালে শুকিয়ে যায় বলে সেটাও অনায়াসে পেরিয়ে তিনি জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন।

ময়নার জঙ্গল বেশ নিবিড় এবং নির্জন। অপদেবতার বাস আছে বলে লোকজন বিশেষ এই জঙ্গলে ঢোকে না। ফলে শুভকাজে বাধা দেওয়ারও কেউ নেই। একটা সুইসাইড নোট লিখে পকেটে রেখে দিলে ভাল হত। কিন্তু এখন কাগজ-কলম জোগাড় করতে গিয়ে সময় নষ্ট করলে মরার ঝোঁকটা ঘুরে যেতে পারে।

জঙ্গলটা প্রাণগোবিন্দর বেশ পছন্দ হয়ে গেল। শীতকালে গাছপালা একটু শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই জঙ্গলটায় তেমন হয়নি। কাছে জলাজমি থাকাতেই বোধ হয় মাটি বেশ সরস। প্রাণগোবিন্দ জঙ্গলের ভিতরবাগে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আগাছা, কাঁটাঝোপ, লতানে গাছ ইত্যাদিতে একটু বাধা পেলেও তিনি দমলেন না। পছন্দমতো একটা গাছ খুঁজে পেলেই হয়। আসলে প্রাণগোবিন্দ জীবনে কখনও গাছেটাছে চড়েননি। কাজেই এমন গাছ চাই যেটাতে অনেক ডালপালা আছে আর সহজেই চড়া যায়। খুব বেশি উঁচু ডালে তিনি উঠতে পারবেন না। ঝুলে পড়ার পক্ষে যতটা দরকার ততটাই উঠবেন। তাই খুব সতর্ক চোখে তিনি তেমন একটা গাছ খুঁজতে লাগলেন।

প্রাণগোবিন্দর কপালটা ভালই। খুব বেশি খুঁজতেও হল না। জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে মিনিটদশেক এদিক-ওদিক হাঁটার পরই তিনি একেবারে মনের মতো গাছ পেয়ে গেলেন। গাছটার একেবারে নিচু থেকেই শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। হাতের নাগালেই। প্রাণগোবিন্দ র‍্যাপারটা খুলে কোমরে জড়িয়ে নিলেন। দড়ির গুছিটাও ভাল করে কোমরে বেঁধে চটিজোড়া গাছতলায় ছেড়ে গাছটার একটা নিচু ডালে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই উঠে পড়লেন। ঘোড়সওয়ারের মতো দু'দিকে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখলেন, ডালপালার ফাঁক দিয়ে গাছটা অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে। দ্বিতীয় ধাপটা উঠতে তাঁর একটু মেহনত হল। হাত এবং পা দু'টোই হড়কে যাওয়ায় পড়েই যাচ্ছিলেন প্রায়। অতি কষ্টে সামলে নিলেন।

দ্বিতীয় ধাপটায় বসে ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করলেন তিনি। এখন খুব তাড়াহুড়ো করার কি দরকার আছে? বরং ধীরে-সুস্থে সাবধানে উঠবার চেষ্টা করাই উচিত। সুতরাং একটু জিরিয়ে নিয়ে তিনি সাবধানে উঠতে লাগলেন। জীবনে এই প্রথম গাছে উঠছেন বলে প্রাণগোবিন্দ বেশ উত্তেজনা বোধ করছেন। মনটায়, এত দুঃখের মধ্যেও, একটা ফুর্তির ভাব হচ্ছে। জীবনে কত অভিজ্ঞতাই বাকি রয়ে গিয়েছে। কেবল বইয়ে মুখ গুঁজেই এতকাল বেঁচে ছিলেন তিনি। জীবনে কোনও অ্যাডভেঞ্চারই করা হয়নি।

উৎসাহের চোটে বেশ অনেকটাই উপরে উঠে পড়লেন প্রাণগোবিন্দ। কতটা উঠেছেন, এতক্ষণ খেয়াল করেননি। হঠাৎ নীচের দিকে চেয়ে মাথাটা বোঁ করে চক্কর দিল তাঁর। বাপ রে! তা প্রায় তিন-চার তলার সমান উঁচুতে উঠে পড়েছেন যে! মাথা ঘুরে ফের হাত ফস্‌কে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দু' হাতে একটা মোটা ডাল জাপটে ধরে সামলে নিলেন। এখান থেকে পড়লেও হয়তো মৃত্যু হবে, তবে ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি চান্স। হয়তো মরলেন না, কিন্তু হাত-পা ভেঙে খানিক যন্ত্রণা পেলেন।

আর উপরে না উঠে প্রাণগোবিন্দ কোমরে গোঁজা দড়িটা একটা মোটা ডালে বেশ ভাল করে বাঁধলেন। অন্য প্রান্তে একটা ফাঁসও তৈরি করে ফেললেন বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায়। আসলে এসব কাজের তো অভ্যেস নেই। জীবনে কখনও দড়ি নিয়ে কসরত করতে হয়নি। ফাঁসটা তৈরি করে যখন টেনেটুনে দেখছেন, তখন কাছেপিঠে হঠাৎ খুকখুক করে যেন একটা চাপা হাসির শব্দ হল।

চমকে উঠে প্রাণগোবিন্দ চারদিকে চাইলেন। এই গহন বনে, গাছের উপরে হাসে কে?

হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, "হয়নি হে, হয়নি। ও কি একটা ফাঁস হল বাপু? ঝুলতে গেলেই যে ফস্‌কা গেরো আলগা হয়ে যাবে।"

প্রাণগোবিন্দ শিউরে উঠে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। দর্শনশাস্ত্রে ভূত বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। তিনিও মানেন না। কিন্তু না মানলেও ভয় করেন। শব্দটা উপর দিক থেকেই আসছে মনে হল। প্রাণগোবিন্দ খুব ঠাহর করে দেখলেন। ডালপালার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় দেখতে পেলেন, আরও আট-দশ ফুট উপরে গাছের ডালে একজন বুড়ো মানুষ বসে-বসে তাঁকে জুলজুল করে দেখছে। প্রাণগোবিন্দ ভয়ে মূর্ছাই যাচ্ছিলেন, কিন্তু পড়ে যাবেন বলে ভয়ে সেটা সামলে নিলেন। তবে শরীরে রীতিমতো হিমশীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে, হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে।

কোনওক্রমে কাঁপা গলায় তিনি বললেন, "আ-আপনি কে? ভূ-ভূত নাকি?"

লোকটা বলল, "তা ভূতও বলতে পার। এক হিসেবে ভূত ছাড়া আর কী? ভূতপূর্ব তো বটেই। তবে এখনও মরিনি, এটুকুই যা তফাত।"

"মরেননি! তা হলে কি আপনি জ্যান্ত মানুষ?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "জ্যান্তই কি আর বলা যায়! তবে আধমরা বলতে পার।"

ঘাবড়ে গেলেও প্রাণগোবিন্দর মনে হচ্ছিল, লোকটা পাগলটাগল হলেও ভূতটুত নয় বোধ হয়। গলাটা এখনও কাঁপছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এখানে কী করছেন?"

"বসে-বসে তোমার কীর্তি দেখছি। তুমি তো নিতান্তই আনাড়ি দেখছি হে। একটা সোজা গাছে উঠতে তিনবার হাত-পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিলে! তারপর ফাঁসের দড়িটা যা বাঁধলে, দেখে হেসে বাঁচি না। ওই ফাঁস গলায় দিয়ে ঝুলবে তো! ঝুললেই গেরো খুলে সোজা নীচে গিয়ে পড়বে ধপাস করে। তাতে অক্কা পেতেও পার, আবার না-ও পেতে পার।"

প্রাণগোবিন্দ এবার একটু ধাতস্থ হলেন। নাঃ, লোকটা আর যাই হোক, প্রেতাত্মাটাত্মা নয়। তিনি গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "আহা, এসব কি আর কখনও করেছি নাকি মশাই? অভ্যেস করতে-করতে শিখে যাব।"

লোকটা একটু খিঁচিয়ে উঠে বলল, "আর শিখেছ! শিখে-পড়ে আটঘাট বেঁধে তবে এসব কাজে নামতে হয়। হুট বললেই কি মরা যায় নাকি? দিনক্ষণ দেখতে হয়। তারপর নিজের শ্রাদ্ধশান্তি সব আগাম

সেরে নিতে হয়। তারপর শুভদিন দেখে স্নানটান করে ভাল-মন্দ বেশ পেটপুরে খেয়ে পান চিবোতে-চিবোতে পট্টবস্ত্র পরে এসে শান্তমনে হাসতে-হাসতে তবে মরে সুখ। বুঝলে?"

প্রাণগোবিন্দর মনে পড়ল, সকাল থেকে তিনি কিছুই খাননি। পেট চুঁই-চুঁই করছে। তেষ্টায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে আছে। মরার উত্তেজনায় এসব শারীরিক বোধ লোপাট হয়েছিল। এবার একটু ভাবিত হয়ে বললেন, "বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি তো বেশ জ্ঞানী লোক।"

"আরে, সেই জন্যই তো সারাদিন গাছে উঠে বসে থাকি। গাছে উঠলে জ্ঞান বাড়ে, বুঝেছ?"

প্রাণগোবিন্দ অবাক হয়ে বললেন, "গাছে উঠলে জ্ঞান বাড়ে? কই, একথা তো কোনও পুঁথি-পুস্তকে পড়িনি!"

"ওরে বাপু, পুঁথি-পুস্তক তো সব মুখস্থ বিদ্যে। ওসব ছাইভস্ম কি জ্ঞান? জ্ঞান অন্য জিনিস বাপু। এই তোমার মতোই একদিন বারো বছর আগে গলায় দড়ি দিতে এই গাছে এসে উঠে বসেছিলুম। আটঘাট বেঁধেই এসেছিলুম। দিনক্ষণ দেখে, গয়ায় গিয়ে নিজের শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদান সব সেরে এসে, একদিন স্নান করে ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের মাংস দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ে, পান মুখে দিয়ে, নতুন ধুতি আর গেঞ্জি পরে, দুর্গানাম স্মরণ করতে-করতে এসে গাছে উঠে মজবুত করে দড়ি বেঁধে মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। ঠিক তখনই, কী বলব রে ভাই, আকাশ থেকে যেন আমার মাথায় জ্ঞানের বৃষ্টি পড়তে লাগল। কত নতুন-নতুন ভাবনা-চিন্তা আসতে লাগল তার লেখাজোখা নেই। মনটা যেন উড়ে-উড়ে বেড়াতে লাগল। ভারী ফুর্তির ভাব। পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিয়ে বুকটাও যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে নিজেই বোঝালুম, তুই তো নিজেকে সৃষ্টি করিসনি। এখন যদি গলায় দড়ি দিস, তা হলে যে তোকে সৃষ্টি করেছে, তার সঙ্গে বেইমানি করা হবে না? বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না? তাকে কি ব্যথা দেওয়া হবে না? আর তাকেই যদি ব্যথা দিস, তা হলে মরেই রেহাই পাবি ভেবেছিস? যখন তোকে শিয়াল-শকুন ছিঁড়ে খাবে, তখন হাড়ে-হাড়ে টের পাবি রে পাপিষ্ঠ!"

প্রাণগোবিন্দ মুগ্ধ হয়ে মাথা নেড়ে-নেড়ে বললেন, "বাঃ, বাঃ, এ তো খুব ভাল কথা। তা তোমার পুঁথি-পুস্তকে আছে এসব কথা?"

"আজ্ঞে না, নেই। তারপর কী হল?"

"কী বলব রে ভাই, সারাজীবন যেসব কথা একবারের জন্যও মাথায় আসেনি, সেসব কথা দিব্যি আকাশ-বাতাস থেকে এসে শাঁ-শাঁ করে নাক, কান, মুখ দিয়ে ঢুকে মগজে সেঁধোতে লাগল। কিছুক্ষণ পর মাথাটা যেন জ্ঞানে একেবারে টইটম্বুর হয়ে উঠল। মরা তো হলই না, বরং মাথাভর্তি জ্ঞান নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলুম। সেই থেকে ঠিক করলুম, সারাদিন গাছে উঠে বসে থাকব। যতদিন বাঁচি, রোজ যত পারি জ্ঞান আহরণ করে যাব।"

"আপনি কি গাছেই থাকেন?"

"তা একরকম তাই বলতে পার। সকালে চাট্টি পান্তা খেয়ে সোজা এসে গাছে উঠে পড়ি। সঙ্গে চিঁড়ে, মুড়ি, জল সব নিয়ে আসি। এখানে একখানা মাচানের মতো করে নিয়েছি। দিব্যি থাকি। এখানেই দিবানিদ্রা সেরে নিই।"

"ও বাবাঃ, ঘুমের ঘোরে পড়ে যাবেন যে!"

"না হে বাপু, তত আহাম্মক নই। এই যে দড়িখানা দেখছ, এটা দিয়েই বারো বছর আগে ফাঁসিতে ঝুলবার মতলব ছিল। তা সেই দড়িখানাই এখন আমার প্রাণরক্ষা করে। ঘুম পেলে দড়িটা দিয়ে নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে তারপর দিব্যি ঘুমোই।"

"নাঃ, আপনি সত্যিই জ্ঞানী লোক।"

"ওই যে বললুম, গাছে উঠলে জ্ঞান বাড়ে।"

প্রাণগোবিন্দ কিছুক্ষণ মাথা চুলকোতে-চুলকোতে ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "কিন্তু আমার যে মরা ছাড়া উপায় নেই। চারদিকে আমার বড় কলঙ্ক রটেছে মশাই, কারও কাছেই মুখ দেখাতে পারছি না। বউ পর্যন্ত আমাকে অবিশ্বাস করে! সেও ধরে নিল যে, গোকুল বিশ্বাসের গোরু আমিই চুরি করে এনে গোয়ালে বেঁধে রেখেছি! না মশাই, এর পর আর বেঁচে থাকার মানেই হয় না।"

"কী নাম বললে? গোকুল বিশ্বাস না কী যেন শুনলাম!"

"যে আজ্ঞে। চরণডাঙার গোকুল বিশ্বাস। তার গোরু গৌরীকে নিয়েই তো যত বখেরা। কয়েকদিন আগে গোকুল বিশ্বাসের আদরের গোরু গৌরী চুরি যায়। রাতের বেলা কে যেন গিয়ে গোকুল বিশ্বাসকে খবর দেয় যে, নসিগঞ্জের প্রাণগোবিন্দ রায়ের বাড়িতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পৌঁছে দিলে গৌরীকে ফেরত দেওয়া হবে। সেই মোতাবেক আজ সকালে গোকুল বিশ্বাসের উকিল প্রভঞ্জন সূত্রধর পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আমার কাছে হাজির।"

"তুমিই কি বাপু নসিগঞ্জের প্রাণগোবিন্দ রায়?"

"যে আজ্ঞে। আমি মশাই সাতেপাঁচে নেই। গোকুল বিশ্বাসকে কস্মিনকালেও চিনি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, গোরুটাকে আমার গোয়ালেই পাওয়া যায়। আর তাতেই সবাই দুইয়ে-দুইয়ে চার ধরে নিয়ে আমাকে চোর ঠাউরে বসল! তাই ঠিক করেছি, বেঁচে থাকার আর কোনও মানেই হয় না।"

লোকটা তরতর করে নেমে এসে প্রাণগোবিন্দর পাশাপাশি আর-একটা ডালে জুত করে বসে বলল, "তাই বলো!"

লোকটার নেমে আসা দেখে প্রাণগোবিন্দ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর হিসেবে লোকটার বয়স না হোক আশির কাছাকাছি তো হবেই। তবু হাতে-পায়ে যেন টারজানের ভেল্‌কি। তিনি গদগদ হয়ে বললেন, "আপনি অতি চমৎকার গাছ বাইতে পারেন তো!"

লোকটা বলল, "ওরে বাপু, বারো বছর ধরে রোজ প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি যে! এ বনে বানর আর হনুমান বড় কম নেই। এখন তারাও আমাকে সমঝে চলে। একবার আমার একছড়া কলা নিয়ে একটা হনুমান পালাচ্ছিল, আমি তেড়ে গিয়ে তার লেজ ধরে মুচড়ে একখানা থাপ্পড় কষিয়ে কলা কেড়ে নিয়ে আসি। তারপর থেকে বেশি ঘাঁটায় না। তা সেকথা যাক, বরং গোকুল বিশ্বাসের কথাটাই শুনি।"

"আর শোনার কিছু নেই। গাঁয়ে আমার বড় বদনাম রটে গিয়েছে মশাই। মানসম্মান নিয়ে থাকার জো নেই।"

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, "হুঁ। গোকুল বিশ্বাসের গোরু যদি চুরি করে থাকো, আর সেই বাবদে যদি গোকুল বিশ্বাস তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে থাকে, তা হলে তো তোমার গলায় দড়ি দিয়ে মরার দরকারই নেই হে! বরং নিশ্চিন্তে বাড়ি গিয়ে নেয়ে-খেয়ে ঘুমোও। গোকুল বিশ্বাসের ঠ্যাঙাড়েরাই এসে তোমাকে মেরে রেখে যাবে।"

প্রাণগোবিন্দ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, "অ্যাঁ! আপনি কি গোকুল বিশ্বাসকে চেনেন?"

"চিনি মানে! আগাপাশতলা চিনি। চরণডাঙার গোকুল বিশ্বাসের নামে গোটা পরগনা কাঁপে। এক সময় দিনেদুপুরে মানুষের গলা নামিয়ে দিত। রামদা চালাত বনবন করে। লাঠি, সড়কি, তলোয়ারে পাকা হাত। বন্দুকের টিপ ছিল অব্যর্থ। গোকলো ডাকাতের মাথার দাম এক সময় লাখ টাকায় উঠেছিল। তবে সেসব এখন ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাজকারবারে মন দিয়েছে। ধান-চালের কল, গুড়ের কারখানা, তেলকল কত কী ফেঁদে বসেছে। তার ডাকাতির স্যাঙাতরাই এখন তার কর্মচারী। গোকুলকে যদি চটিয়ে থাকো, তা হলে আর তোমার মরার ভাবনা নেই। কষ্ট করে গাছ বেয়ে, দড়ি খাটিয়ে, ফাঁস লটকে মরতে যাবে কোন দুঃখে? হাসতে-হাসতে বাড়ি চলে যাও। গোকুল বিশ্বাসই তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে। ভাল করে কিছু টের পাওয়ার আগেই দেখবে দাঁত ছিরকুটে মরে পড়ে আছ। তাতে একটা সুবিধেও হবে হে। আত্মঘাতী হলে নাকি খুব পাপ হয়। খুন হলে সেই পাপের হাত থেকেও বেঁচে যাবে।"

প্রাণগোবিন্দের গলা আগে থেকেই শুকিয়ে ছিল। এখন যেন শিরিষ কাগজের মতো খরখর করছে। তিনি বললেন, "মশাই, বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাওয়াবেন?"

"আহা, শুধু জলই বা কেন? সেই সঙ্গে এক ডেলা গুড় দিয়ে চাট্টি মুড়িও খাও। আমার সব ব্যবস্থা আছে। শত হলেও তুমি তো অতিথি হে।"

প্রাণগোবিন্দ মুড়ি, গুড় আর জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হলেন। তারপর বললেন, "প্রভঞ্জন সূত্রধরের কথা শুনে মনে হয়েছিল, গোকুল বিশ্বাস লোকটার বোধ হয় বড় নরম মন। গোরুর উপর যার অত মায়াদয়া।"

"কথাটা মিথ্যে নয় বাপু। গোকুল একেবারে গৌরী-অন্ত প্রাণ।"

"আচ্ছা, সে যদি ঠ্যাঙাড়ে দিয়ে আমাকে খুনই করাবে, তা হলে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ পাঠানোর কী দরকার ছিল বলুন তো?"

"এক কথা, টাকা না পেলে তুমি গৌরীর কোনও ক্ষতিও তো করতে পার। তাই সে টাকা পাঠিয়ে সেটা বন্ধ করল। গৌরী-উদ্ধারের পর এখন তার অন্য চেহারা। ওই পঞ্চাশ হাজার তো তোমার যাবেই, সেই সঙ্গে তোমার ঘরের যা আছে তাও চেঁচেপুঁছে নিয়ে যাবে, এ তুমি ধরেই রাখতে পার।"

"সর্বনাশ! তা হলে উপায়?"

এবার বুড়ো লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, "আচ্ছা, তোমার আক্কেলখানা কী বলো তো!"

"কেন, কোনও দোষ করলুম নাকি?"

"করলে না? যে লোক গলায় দড়ি দিতে এসেছে তার কেনই বা এত পিছুটান, আর কেনই বা এত বিষয়ের চিন্তা, আর কেনই বা এত সর্বনাশের ভয়! তাই তো বলছিলুম রে বাপু, আটঘাট বেঁধে মরতে হয়। আধখেঁচড়া ভাব নিয়ে মরলে কি সুখ হয়? ওরে বাপু, তুমি তো মরার জন্য পা বাড়িয়েই আছ। এখন গোকুল বিশ্বাস যদি তোমার বাড়িতে চড়াও হয়, তাতে তোমার কোন লবডঙ্কা? না হে, তোমার বৈরাগ্যটাই আসেনি, তা হলে মরে হবেটা কী?"

প্রাণগোবিন্দকে ব্যাপারটা স্বীকার করতে হল। তিনি সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তা বটে। তবে মনটা বড় খচখচ করছে যে!"

"ও খচখচানিটাই তো মায়া হে। দড়িদড়া না খুললে কি নৌকো পাড়ি দিতে পারে? ওই দড়িদড়াই হল মায়া, বুঝলে? বন্ধন না খুললে নৌকো ঘাট ছেড়ে এগোবে কী করে?"

"বাঃ, আপনি সত্যিই জ্ঞানী লোক!"

"গাছে উঠলেই জ্ঞান বাড়ে হে, গাছে উঠলেই জ্ঞান বাড়ে।"

"আচ্ছা, আজ রাতেই কি গোকুল বিশ্বাস আমার বাড়িতে চড়াও হবে বলে মনে হয়?"

"ওরে বাপু, আমি তো তার পাশের গাঁ হবিবপুরেই থাকি। গত চল্লিশ বছর ধরে তার কাজকারবার দেখে আসছি। এতক্ষণে তার চরেরা তোমার বাড়ির চারপাশে মোতায়েন হয়ে গিয়েছে। কড়া নজর রাখছে চারদিকে, যাতে টাকাটা পাচার না হতে পারে। রাত একটু নিশুতি হলেই তার গুন্ডারা এসে হাজির হয়ে যাবে। বিনা মেহনতে যদি মরতে চাও, তবে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকো।"

প্রাণগোবিন্দ আর-একটু ভাবলেন। মুড়ি আর গুড় পেটে যাওয়ার পর তাঁর মাথাটা বেশ ভাল কাজ করছে। তা ছাড়া গাছে উঠলে জ্ঞান বাড়ে, এ-কথাটাও বোধ হয় খুব মিথ্যে নয়। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, এতক্ষণে তাঁর দু'টি নাতি-নাতনি, পিউ আর পিয়াল এসে গিয়েছে। গোকুল বিশ্বাসের গুন্ডারা যদি হামলা করে, তা হলে নিষ্পাপ দু'টি শিশুর বিপদ হতে কতক্ষণ? তিনি হঠাৎ গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "দেখুন মশাই, মরতে আমার তেমন ভয় হচ্ছে না। তবে, আমার বিরুদ্ধে এরকম একটা ষড়যন্ত্র কে করল, সেটা না জেনে মরাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তা ছাড়া আমার দু'টি নাতি-নাতনিও আছে। তাদেরও রক্ষা করা দরকার।"

দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু বিচক্ষণ হাসি হেসে লোকটা বলল, "মরা যে তোমার বরাতে নেই, তা তোমার রকম দেখেই আঁচ করেছিলুম। আমি বলি কী, মরার আগে একটু ভাল করে বেঁচে উঠলে তবে মরার একটা মানে হয়। আধমরাদের তো বাঁচা-মরার মধ্যে বিশেষ তফাত নেই। কী বলো হে?"

"অতি যথার্থ কথা। আপনি জ্ঞানী লোক।"

"গাছে ওঠার অভ্যেস করো, তুমিও জ্ঞানী হবে। তা যা বলছিলাম, যথার্থ মরতে হলে আগে যথার্থ বেঁচে ওঠা চাই। আধমরা ভাবটা ঝেড়ে ফেলে এবার একটু বেঁচে ওঠো তো বাপু!"

"যে আজ্ঞে। কিন্তু তার জন্য কী করতে হবে বলুন তো! ব্যায়াম নাকি?"

"না হে।"

"তবে কি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাব, নাকি কোবরেজের কাছে যাব? নাকি হোমিওপ্যাথি ধরব?"

"ওতে কাজ হবে না হে। অন্য নিদান দেখতে হবে।"

॥ ৩ ॥

আজ বাসে একজন ম্যাজিশিয়ান উঠেছিল। যেমন সুন্দর তার চেহারা, তেমনই আশ্চর্য তার ম্যাজিক। রাস্তাঘাটে ঘুরে-ঘুরে যারা ম্যাজিক দেখায়, তাদের যেমন ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা পোশাক থাকে গায়ে, এ লোকটার মোটেই তেমন নয়। রীতিমতো ঝকঝকে কালো কোট-প্যান্ট আর সাদা শার্টের সঙ্গে লাল টাই। মাথায় একটা লম্বা কালো টুপি, দু'হাতে সাদা দস্তানা।

প্রথমেই সবাইকে নমস্কার করে হাতের দস্তানা দু'টো খুলে ফেলল সে। তারপর দু'টো দস্তানাই ছুড়ে দিল শূন্যে। অবাক কাণ্ড! দস্তানা দু'টো শূন্যে ভেসে-ভেসে অদ্ভুত সব নাচের মুদ্রা দেখাতে লাগল। তারপর দু'টো দস্তানা নিজেরাই হাততালি দিল, পরস্পর ঘুসোঘুসি করল, পাঞ্জা লড়ল, তারপর নমস্কার করে খেলা শেষ করল।

তারপর টুপির খেলা। লোকটা মাথা থেকে টুপিটা খুলে সবাইকে টুপির ভিতরটা দেখাল, সেটা একদম ফাঁকা। তারপর টুপির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে সে প্রথমে একটা খরগোশ, তারপর একটা টিয়াপাখি, একটা সবুজ জ্যান্ত সাপ বের করে একে-একে একটা ঝোলায় পুরল! তারপর এক ভাঁড় গরম চা বের করে সামনের সিটের এক ভদ্রলোককে দিল। তিনি একটু ভয়ে-ভয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "বাঃ, এ তো চমৎকার চা।"

এর পর ম্যাজিশিয়ান কয়েকটা রুমাল বের করে বিলিয়ে দিল। দু'জনকে দিল ডটপেন, কাউকে দু'টো বিস্কুট, কাউকে লজেন্স। সবশেষে দু'টো চকোলেট-বার বের করে পিউ আর পিয়ালকে দিয়ে বলল, "তোমরা তো অচেনা লোকের হাতের খাবার খাও না, তাই না? তবু রেখে দাও।"

নসিগঞ্জের অনেক আগেই তালপুকুর নামে একটা জায়গায় সেই আশ্চর্য ম্যাজিশিয়ান নেমে গেল। বাসের সবাই বলাবলি করছিল, এরকম ভাল ম্যাজিক বহুদিন দেখা যায়নি। আর লোকটাও কী ভাল! কারও কাছ থেকে পয়সাও চাইল না!

ম্যাজিশিয়ান নেমে যাওয়ার পরই শান্তামাসি বলল, "ওই চকোলেট দুটো আমার কাছে দাও। নইলে তোমরা আবার ভুল করে খেয়ে ফেলবে।"

শান্তামাসি তাদের আয়া। খুব কড়া ধাতের মানুষ। মুখে একটুও হাসি নেই। তবে কড়া মানুষ হলেও শান্তামাসি খারাপ লোক নয়, তাদের খুব যত্নআত্তি করে, দেখেশুনে রাখে।

পিউ বলল, "আচ্ছা মাসি, ম্যাজিশিয়ান কী করে জানল যে, আমরা অচেনা লোকের দেওয়া খাবার খাই না?"

শান্তামাসি বিরস মুখে বলল, "তা জানি না। তবে পাজি লোকেরা

অনেক খোঁজখবর রাখে।"

পিউয়ের কথাটা একটুও বিশ্বাস হল না। লোকটাকে তার কখনও পাজি বলে মনেই হয়নি। সে বলল, "এটা আমি কিছুতেই খাব না মাসি। কিন্তু মোড়কটা তো খুব সুন্দর, এটা আমার কাছে একটু থাক।"

শান্তামাসি অবশ্য আর কিছু বলেনি। চকোলেট-বারটা পিউয়ের কাছেই রয়ে গিয়েছে। তবে পিয়াল ছোট আর পেটুক বলে ওরটা শান্তামাসি নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।

শহরে বাবুপাড়ায় তারা যে বাড়িতে থাকে, সেই বাড়িটা কেমন যেন গম্ভীর আর রাগী চেহারার বাড়ি। ও বাড়ির হাওয়ায় মনখারাপের জীবাণু ঘুরে বেড়ায়। না হবেই বা কেন! তাদের মা-বাবা দু'জনেই ভারী ব্যস্ত ডাক্তার। সারাদিন তাঁরা বাড়িতে থাকেনই না। যখন থাকেন, তখন দু'জনের মধ্যে কেবল রোগ আর ওষুধ নিয়ে কথা হয়! হাসিঠাট্টা, মজা কিচ্ছু নেই। নসিগঞ্জের বাড়িটা ঠিক উলটো। এ বাড়িটা যেন সব সময় হাসছে, খুশি আর আনন্দে ডগমগ করছে। খোলামেলা আর হাসিখুশি এ বাড়িটায় ঢুকলেই পিউ আর পিয়ালের মন ভাল হয়ে যায়। ঠিক যেন রূপকথার বাড়ি। এ বাড়িতে তার আনমনা ভুলো মনের দাদু আর ভারী নরম মনের ঠাকুরমা থাকেন। এ বাড়ির বাতাসে যেন মজা বিজবিজ করছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজ সেরকম হল না। বাস থেকে নেমে শান্তামাসির সঙ্গে সামান্য পথ হেঁটে পিউ আর পিয়াল যখন বাড়িটার সামনে পৌঁছোল, তখন পিউয়ের স্পষ্ট মনে হল, আজ এ বাড়িটার যেন কেমন বিষণ্ণ, হতশ্রী চেহারা। কেমন যেন গম্ভীর, দুঃখী-দুঃখী ভাব।

পিউ চুপিচুপি পিয়ালকে বলল, "ভাই, দেখেছিস, আজ বাড়িটা যেন ভীষণ গম্ভীর!"

পিয়ালের বয়স মোটে পাঁচ বছর। সে অত কিছু বোঝে না। সে দিদির হাত চেপে ধরে শুধু বলল, "হ্যাঁ রে দিদি, বাড়িটার বোধ হয় খিদে পেয়েছে।"

পিয়াল একটু পেটুক আছে। সে জানে, খিদে পেলেই লোকের যত কষ্ট।

আজ বারান্দায় দাদু নেই, চেয়ারটা খালি। বাড়িতে ঢুকে শুনল, দাদু নাকি কোথায় জরুরি কাজে গিয়েছেন, ফিরতে দেরি হবে। পিউয়ের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে হল দাদুর চামচা। সবাই বলে, এমন দাদুভক্ত নাকি দেখা যায় না। তা, কথাটা সত্যি। তার দাদু ভারী অন্যমনস্ক মানুষ। ভোলাবাবুকে তপনবাবু বলে ভুল করেন, স্নান করতে বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে সাবান খুঁজে না পেয়ে চেঁচামেচি করেন, ধুতি পরতে গিয়ে কতদিন ঠাকুরমার শাড়ি দিব্যি কাছাকোঁচা দিয়ে পরে বেরিয়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি করেছেন। পিউ সারাক্ষণ দাদুর সঙ্গে চিমটি খেয়ে লেগে থাকে। দাদুর ভুলভাল ধরিয়ে দেয়, শাসনও করে খুব। দাদুরও তাতে ভারী আহ্লাদ। পিয়াল পেটুক বলেই বোধ হয় ঠাকুরমার আঁচল ধরে থাকতে ভালবাসে।

পিউয়ের আজ খেতে ইচ্ছে করছিল না। ঠাকুরমা সাধাসাধি করায় একখানা মাত্র লুচি খেল। তারও আধখানা কাককে দিয়ে দিল। তারপর চুপচাপ একটা গল্পের বই নিয়ে সামনের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে রইল। না, বই পড়াতেও তার মন ছিল না। কখন দাদু আসবেন, সেজন্য ঘনঘন রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিল।

ম্যাজিশিয়ানের দেওয়া চকোলেট-বারটা বারবার ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখছিল পিউ। এটা তার চেনা চকোলেট-বার নয়। মোড়কটা অন্যরকম। ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখতে গিয়ে এক সময় তার চোখে পড়ল, মোড়কের পিছনে নীচের দিকে খুব খুদে অক্ষরে ছাপা, মেড ইন ইংল্যান্ড। সে ভারী অবাক হল। গাঁয়ের ম্যাজিশিয়ানের কাছে বিলিতি চকোলেট এল কোথা থেকে? সে একটু কৌতূহলী হয়ে মোড়কের একটা ভাঁজ খুলে গন্ধ শুঁকতে গিয়ে দেখে, মোড়কের ভিতরে একটা ছোট্ট চিরকুট রয়েছে। তাতে পেনসিল দিয়ে কিছু লেখা।

অবাক হয়ে চিরকুটটা বের করে এনে সে দেখল, তাতে ভারী সুন্দর ছাঁচে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা, 'তোমাদের খুব বিপদ আসছে, সাবধান! বিক্রমজিৎকে মনে রেখো।' ব্যস, আর কিচ্ছু নেই।

পিউ অনেক বার চিরকুটটা পড়েও মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। চিরকুটটা ঠাকুরমাকে দেখাবে কিনা ভাবল। কিন্তু বড়দের একটা দোষ হল, তাঁরা ছোটদের কোনও কথাকেই তেমন পাত্তা দেন না। কাগজের টুকরোটা দাদুর পঞ্জিকার মধ্যে গুঁজে রেখে পিউ চুপ করে উঠে এসে দেখল, শান্তামাসি কোথায়! মাসি বাথরুমে গিয়েছে দেখে সে এসে বাইরের ঘরে রাখা শান্তামাসির ব্যাগটা থেকে পিয়ালের চকোলেট বারটা খুলে দেখল, তাতে কোনও চিরকুট নেই। তা হলে কি চিরকুটটা পিউকেই উদ্দেশ্য করে লেখা? কিন্তু ম্যাজিশিয়ান তো তাকে চেনেই না!

মাত্র আট বছর বয়স হলেও পিউ বেশি বকবক করে না। সে চাপা স্বভাবের মেয়ে। কথা কওয়ার চেয়ে বরং সে ভাবতেই বেশি ভালবাসে। আর সব কিছু বোঝার চেষ্টা করে। বিক্রমজিৎ নামটাও সে আগে কখনও শোনেনি, এই নামের কাউকে চেনারও প্রশ্ন ওঠে না। তাই সে বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। চিরকুটে লিখেছে 'বিক্রমজিৎকে মনে রেখো'। বেশ কথা। কিন্তু যাকে সে চেনেই না, তাকে সে কী করে মনে রাখবে?

ঠিক এই সময় ফটক খুলে হাসিমুখে গোরাং দাস এসে ঢুকল। গোরাংকে দেখে ভারী খুশি হয়ে পিউ চেঁচিয়ে উঠল, "গোরাংদা!"

এ বাড়িতে যে ক'জন ভিখিরি আসে তাদের সবাইকেই চেনে পিউ। এ বাড়িতে সবাইকেই ভিক্ষে দেওয়া হয়। কেউ-কেউ আবার পাত পেড়ে খেয়েও যায়, সুখ-দুঃখের কথাও কয়। তারা বেশ লোক। গোরাং দাসও ভিখিরি বটে, কিন্তু অন্য সব ভিখিরির মতো নয়। সে বেশ পরিষ্কার একখানা আলখাল্লা পরে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, বাবরি চুল ভাল করে আঁচড়ানো, কুচকুচে কালো দাড়িগোঁফ, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। রামপ্রসাদী গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। নসিগঞ্জ আর আশপাশের পাঁচ-সাতটা গাঁয়ের প্রায় সব বাড়িতেই তার অনায়াস গতিবিধি।

কেউ-কেউ বলে, গোরাং দাস হল স্পাই। কার স্পাই, কীসের স্পাই তা অবশ্য কেউ বলতে পারে না। কেউ আবার বলে, গোরাং হল শিবের অবতার। আবার কেউ বলে, তার সঙ্গে নাকি ডাকাতের দলের যোগাযোগ আছে।

পিউ তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি ভিক্ষে করো কেন গোরাংদা? তোমাকে দেখে তো একটুও ভিখিরি বলে মনে হয় না!"

মাথাটাথা চুলকে গোরাং বলেছিল, "কথাটা কী জানো দিদি, বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না! ছেলেবেলা থেকেই আমার ভিখিরি হওয়ার শখ। স্কুলের পরীক্ষায় একবার রচনা এসেছিল 'বড় হইয়া তুমি কী হইতে চাও?' আমি খুব ফলাও করে লিখেছিলুম, 'বড় হইয়া আমি ভিখারি হইব।' তাতে অবশ্য মাস্টারমশাই গোল্লা দিয়েছিল।"

"এ মা! তুমি ভিখিরি হতে চাইলে কেন?"

"ভিখিরি হওয়ার যে অনেক সুবিধে দিদি। সারাদিন ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো যায়। কাজকর্ম করতে হয় না। কারও হুকুম তামিল করতে হয় না। বিনা মেহনতে রোজগারপাতিও হয়।"

"আচ্ছা, লোকে যে বলে, তুমি নাকি স্পাই!"

চোখ বড়-বড় করে গলা নামিয়ে গোরাং বলল, "সেকথাও মিথ্যে নয় দিদি। আমি গুপ্তচরও বটে। অনেকের অনেক হাঁড়ির খবর আমার ঝুলিতে আছে।"

"ধেৎ! তোমাকে স্পাই বলে মনেই হয় না!"

"আহা, তুমি বুঝতে পারছ না। স্পাইকে স্পাই বলে চেনা গেলে সে আবার কীসের স্পাই? তাই আসল স্পাইকে কখনও স্পাই বলে মনেই হবে না তোমার!"

"কিন্তু তোমাকে যে ভিখিরি বলেও মনে হয় না গোরাংদা। তোমার জামাকাপড় কেমন পরিষ্কার, চুল কেমন আঁচড়ানো, মনে হয় দাঁতও

মাজো, খোঁড়াও নও, কানাও নও, নুলোও নও। তবে তুমি কেমন ভিখিরি?"

"আহা, ভিখিরি কি একরকম? কানা ভিখিরি, খোঁড়া ভিখিরি, ঘেয়ো ভিখিরি যেমন আছে, তেমনই গায়ক ভিখিরি, সাধু ভিখিরি, বাউল ভিখিরি, ফকির ভিখিরিও আছে। আবার চালাক ভিখিরি, বোকা ভিখিরি, আসল ভিখিরি, নকল ভিখিরি — ভিখিরির কি শেষ আছে? আমি তো একটা বই লিখব বলে ঠিক করে রেখেছি, 'ভিখারি কাহাকে বলে ও কয় প্রকার'।"

"তুমি তা হলে কেমন ভিখিরি গোরাংদা?"

গোরাং মাথা চুলকে বলেছিল, "এই তো মুশকিলে ফেললে দিদি, নিজের মুখে কি আর নিজের কথা বলা যায়?"

তা সে যাই হোক, গোরাং দাসকে ভিখিরি বলে মনে হয় না পিউয়ের। দাদু আর ঠাকুরমাও গোরাংকে ভারী খাতির করেন।

আজ গোরাংকে দেখে মনখারাপের ভাবটা একটু কমল পিউয়ের। গোরাং বারান্দার সিঁড়ির ধাপে জুত করে বসে বলল, "পিউদিদি, আজ যে তোমার মুখখানা তেমন হাসিখুশি নয়! চোখ তো তেমন ঝলমল করছে না! কী ব্যাপার?"

"আমার মনখারাপ গোরাংদা। এ বাড়িটায় আজ যেন কী একটা হয়েছে। কেউ কিছু বলছেন না, দাদু কোথায় চলে গিয়েছেন, ফিরতে নাকি দেরি হবে। দাদুকে ছাড়া একটুও ভাল লাগছে না যে!"

গোরাং একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "সব দিন কি আর সমান যায় পিউদিদি? এক-একটা খারাপ দিনও এসে পড়ে মাঝে-মাঝে। তবে এসব দুষ্টু দিনগুলো না এলে আবার ভাল দিনগুলো কতটা ভাল তা বোঝা যায় না কিনা।"

"আজকের দিনটা কি দুষ্টু দিন গোরাংদাদা?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। পিউদিদির যখন মনখারাপ, তখন বলতেই হবে যে, আজকের দিনটা ভাল দিন নয়।"

"আচ্ছা গোরাংদাদা, আমার দাদুর মতো ভাল লোক তুমি দেখেছ?"

গোরাং মাথা নেড়ে বলল, "না দিদি, আমি সাত গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই, কত লোকের সঙ্গে দিব্যি আমার দেখা হয়। সত্যি কথা বলতে কী, রায়মশাইয়ের মতো এমন নিপাট ভালমানুষ আমি আর-একটাও দেখিনি।"

পিউ খুব করুণ মুখ করে বলল, "তা হলে ঠাকুরমা কেন বিড়বিড় করে দাদুকে বকছেন বলো তো!"

"বকছেন নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। ঠাকুরমার মেজাজ খারাপ হলেই কেন যে দাদুকে বকেন? আজও বারবার বলছেন, 'বুড়ো বয়সের অধঃপতন! বুড়ো বয়সের অধঃপতন।'

গোরাং একটু গুম মেরে গেল।

গোরাং দাস একটু আগে নিতাইবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। গিয়ে দ্যাখে, নিতাইবাবুর মেজাজটা আজ বেজায় খাট্টা হয়ে আছে। রাগে আপন মনেই গজগজ করে যাচ্ছেন। বাজার থেকে ফিরে ঘেমো জামাটা খুলে সবে রোদে শুকোতে দিচ্ছেন, ঠিক এমন সময় গোরাং গিয়ে গান ধরেছে, "আমায় দাও মা, তবিলদারি ..."

নিতাইবাবু কালীভক্ত লোক। গোরাং দাস এসে গান ধরলে অন্য সময় তাঁর বেশ ভক্তিভাব হয়। চোখ বুজে মাথা নেড়ে-নেড়ে শোনেন, কিন্তু আজ গোরাংয়ের গলা পেয়েই যেন খেপে উঠলেন, ছুটে এসে তম্বি করে বললেন, "তোমার আক্কেল কী হে গোরাং? বলি লজ্জাশরমও কি বিসর্জন দিয়েছ?"

গোরাং অবাক হয়ে বলে, "কেন মশাই, সুরে ভুল হল নাকি?"

"সুর নিয়ে কথা হচ্ছে না। বলি, আমার মতো ছাপোষার বাড়িতে ভিক্ষে করতে তোমার লজ্জা হয় না? যাও না, ওই প্রাণগোবিন্দ রায়ের বাড়িতে! ঘরে বসে দোহাত্তা কামাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি কানা? লাখো-লাখো টাকা লোকে বাড়ি বয়ে এসে সেলাম ঠুকে দিয়ে যাচ্ছে। তা সে-বাড়ি ছেড়ে আমাদের মতো গরিবগুরবোর বাড়িতে আসা কেন?"

নিতাইবাবুর গিন্নি গিরীন্দ্রমোহিনী অত্যন্ত দাপুটে মহিলা। নিতাইবাবুর চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এসে বললেন, "তা ও বেচারির উপর তম্বি করা কেন? ও তো আর দোষ করেনি। বলি, প্রাণগোবিন্দ রায়ের মতো বুকের পাটা আছে তোমার? তিনি তো আর মেনিমুখো নন তোমার মতো, যাকে বলে বাপের ব্যাটা! গোকুল বিশ্বাসের মতো অমন সাংঘাতিক লোকের কান মুচড়ে টাকা আদায় করল। পারবে তুমি সাতজন্মে ওরকম হতে? এই নিরীহ বেচারার উপর গায়ের ঝাল ঝাড়ছ যে বড়! তোমারই তো লজ্জা হওয়া উচিত! প্রাণগোবিন্দবাবুকে দেখে শেখো। নমস্য ব্যক্তি, এতদিনে গাঁয়ে একটা সত্যিকারের পুরুষমানুষ দেখলুম!"

নিতাইবাবু নিতান্তই মিইয়ে গেলেন। যেমন গরম দুধে পড়ে মুড়ি নেতিয়ে যায়, ঠিক তেমনই।

ওদিকে পরেশবাবুর বাড়িতেও প্রাণগোবিন্দকে নিয়ে বেশ একটা মনকষাকষি হচ্ছে। গোরাং গিয়ে শুনতে পেল। পরেশবাবু তাঁর গিন্নি নবদুর্গাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, "আহা, তা বলে গোরু চুরি করা কি ভাল?"

নবদুর্গা ফুঁসে উঠে বললেন, "চুরি! চুরি হতে যাবে কেন? গোরু চুরি তো ছোটলোকের কাজ! উনি যা করেছেন, সেটাকে বলা হয় অপহরণ। অপহরণ আর চুরি কি এক জিনিস হল? শুধু তাই নয়, উনি সেই গোরুবাবদ মুক্তিপণ আদায় করেছেন। তোমার মুরোদে কুলোবে? গোরুচোর বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেই তো হবে না। গোকলো ডাকাত কত খুনখারাপি করেছে জানো? কত লোকের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে পথে বসিয়েছে! আজ তাকেই কেমন উচিত শিক্ষা দিলেন প্রাণগোবিন্দবাবু! আমার তো গিয়ে লোকটাকে পেন্নাম করতে ইচ্ছে করছে।"

পরেশবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে গোরাংয়ের কাছে বসে পড়লেন। বললেন, "শুনলি গোরাং, শুনলি! গোরু চুরিও নাকি একটা বীরত্বের কাজ! তাই যদি হবে, তা হলে দেশের বড়-বড় বীরেরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন! তুই-ই বল!"

ব্যাপারটা তখনও কিছু বুঝতে পারছিল না গোরাং দাস। যখন এই বাড়ির দিকে আসছে, তখন বনমালী ঘোষ বাজার সেরে ফিরছিলেন। তাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, "প্রাণগোবিন্দবাবুর বাড়িতে যাচ্ছিস বুঝি গোরাং? তা যা, আজ ভালই পাবি। একটু আগে দেখলুম, বাবু নতুন দড়ি কিনে উত্তরমুখো রওনা হলেন। আবার কার গোরু ঘরে আনতে গেলেন কে জানে বাবা!"

"আচ্ছা গোরাংদাদা, তুমি বিক্রমজিৎ নামের কাউকে চেনো?"

গোরাং একটু আনমনা ছিল। প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হয়ে বলল, "কার নাম বললে?"

"বিক্রমজিৎ।"

মাথা নেড়ে গোরাং বলে, "না দিদি, ও নামে কাউকে তো চিনি না!"

"তবে যে তুমি বলো, সাত গাঁয়ের সব লোককে চেনো!"

"তা চিনি বইকি! সব লোককেই চিনি। নাড়িনক্ষত্র জানি।"

"তা হলে বিক্রমজিৎকে চেনো না কেন?"

"সে কি এখানকার লোক দিদি? কাছেপিঠে থাকে?"

"কোথায় থাকে তা তো জানি না!"

"কেমন চেহারা?"

"তাকে কি আমি দেখেছি নাকি?"

গোরাং অবাক হয়ে বলে, "তুমিও চেনো না? নামটা তা হলে কোথায় পেলে?"

"একটা কাগজে লেখা ছিল।"

"কোন কাগজ?"

পিউ পঞ্জিকার ভিতর থেকে চিরকুটটা বের করে গোরাংয়ের হাতে দিয়ে বলল, "এই দ্যাখো!"

গোরাং চিরকুটটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর মাথা তুলে বলল, "এ তো তুলোট কাগজ। আজকাল এ কাগজ পাওয়াই যায় না। এ চিঠি তোমাকে কে দিল দিদি?"

পিউ একটু হেসে বলল, "একজন ম্যাজিশিয়ান। যেমন সুন্দর তার চেহারা, তেমনই ভাল তার ম্যাজিক।"

"বটে! তা, তার ম্যাজিক তুমি দেখলে কোথায়?"

"বাসের মধ্যে। সে কিন্তু ম্যাজিক দেখিয়ে পয়সা নেয়নি। বরং সবাইকে বিস্কুট, লজেন্স, চকোলেট, চা এসব দিয়েছে। ভারী ভাল লোক।"

গোরাং ঘনঘন মাথা চুলকে বলল, "এ তল্লাটে ম্যাজিশিয়ান তো মোটে পাঁচজন। সাত গাঁয়ের গগন চটপটি, হবিবপুরের সনাতন মুস্তাফি, ময়নার হারাধন পোদ্দার, চরণডাঙার সুমন্ত ঘোষ আর কুঞ্জপুকুরের ফটিক দাস। ফটিক আর সুমন্ত ছাড়া বাকি সব বুড়োহাবড়া। তুমি যেমন বলছ, তেমন সুন্দর চেহারা কারও নয়। তা হলে ম্যাজিকটা দেখাল কে, সেটাই ভাবনার কথা। আরও একজন ম্যাজিক জানে বলে শুনেছি। সে হল বীরপুরের বটুক সামন্ত। কিন্তু সে কখনও ম্যাজিক দেখায় না।"

"তুমি কিছু জানো না। লোকটা তালপুকুরে নেমে গেল। নিশ্চয়ই তালপুকুরেই বাড়ি।"

এবার কেমন ভ্যাবলার মতো পিউয়ের দিকে চেয়ে রইল গোরাং। অনেকক্ষণ কথাই বেরোল না মুখ দিয়ে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "তালপুকুর! বিক্রমজিৎ! কিন্তু তা কী করে হয়? সেটা যে অসম্ভব!"

"কী বলছ গোরাংদাদা?"

"মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করছে দিদি। বড্ড গন্ডগোল পাকিয়ে দিয়েছ তুমি। তালপুকুর আর বিক্রমজিৎকে যে মেলাতে পারছি না! একথাও ঠিক যে, তালপুকুরে বিক্রমজিৎ নামে এক জাদুকর থাকত। সাংঘাতিক জাদুকর। এমন সব অশৈলি কাণ্ড করত যে, লোকে বেজায় ভয়ও পেত তাকে। কিন্তু দিদি, সে তো একশো বছর আগেকার কথা! বিক্রমজিৎ তো কবেই মরে গেছে। তাই ভাবছি, বিক্রমজিতের ভেক ধরে এ আবার কে উদয় হল! তার মতলবটাই বা কী! সে চিরকুটটাই বা কেন দিল তোমাকে! আর বিপদের কথাই বা বলল কেন? মাথার ভিতর সব তালগোল পাকিয়ে গেল যে!"

"তোমার তো সব সময়ই মাথা তালগোল পাকিয়ে যায়। একবার যে তোমাকে গালিভারের গল্প বলেছিলুম, সেটা শুনেও তোমার মাথা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল!"

"হ্যাঁ দিদি, সেকথা ঠিক। তবে বিক্রমজিৎ আর তালপুকুরের ব্যাপারটা আরও গোলমেলে। যদি সত্যিই তার রাজপুত্তুরের মতো চেহারা হয়, তা হলে আরও ভাবনার কথা। কারণ, একশো বছর আগে যে বিক্রমজিৎ জাদুর খেলা দেখাত, তারও চেহারা ছিল নাকি কার্তিক ঠাকুরটির মতো। কিন্তু মুশকিল কি জানো? তালপুকুরের বিখ্যাত জাদুকর বিক্রমজিৎ একশো বছর আগে খুব অল্প বয়সেই মারা গেছে। লোকে দুঃখ করে বলে, বেঁচে থাকলে সে নাকি দুনিয়ার সব জাদুকরকে হারিয়ে দিত।"

"ধেৎ! এ সে নয়। এ খুব ভাল লোক। আমাকে একটা চকোলেট-বার দিয়েছে। এই দ্যাখো।"

গোরাং জিনিসটা দেখে বলল, "বাহারি মোড়ক দেখছি।"

"তুমি নেবে?"

মাথা নেড়ে গোরাং বলে, "না দিদি, ওসব জিনিসের মর্ম কি আমরা বুঝি? আমাদের মোটা চালের রাঙা ভাত আর লঙ্কা ছাড়া মুখে কিছু রোচে না। ওটা তুমিই খেও।"

"আমরা তো অচেনা লোকের দেওয়া জিনিস খাই না।"

"তবু রেখে দাও। ব্যাপারটা গোলমেলে বটে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে হয়তো কোনও গুপ্তকথা বেরিয়ে আসবে। আজ উঠছি দিদি। চিরকুট আর চকোলেটটা লুকিয়ে রাখো। হাতছাড়া কোরো না।"

"ওমা! তুমি যাচ্ছ কোথায়? তোমাকে ভিক্ষেই দেওয়া হয়নি!"

"সে আর-একদিন হবে'খন দিদি। যা একখানা গোলমেলে ভাবনা

ঢুকিয়ে দিলে মাথায়। আগে তার জট ছাড়াই, তারপর ভিক্ষের কথা ভাবা যাবে।"

॥ ৪ ॥

বটুকবাবু নিবিষ্টমনে তাঁর পানাপুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছেন। পুকুরে জল দেখা যায় না। জলের উপরে পুরু পানা ভেসে আছে। বটুকবাবুর আর কোনও দিকে নজর নেই। একদৃষ্টে যেখানে ছিপ ফেলেছেন, সেই জায়গায় চোখ রেখে বসে আছেন। তাঁর পাশে থাবা পেতে আছে বাঘা কুকুরটা। বটুকবাবুর কুকুর টবির ডাক শোনা যায় না। ঘেউ-ঘেউ করার কুকুরই নয়। শোনা যায়, বাড়িতে বাইরের অচেনা কেউ ঢুকলে নিঃশব্দে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে গলার নলি ছিঁড়ে দেয়। তেমন ঘটনা অবশ্য আজ অবধি ঘটেনি। তবে রটনা আছে বলে বটুকবাবুর বাড়িতে কেউ ঢোকে না। কুকুর যেমন ডাকে না, তেমনই বটুকবাবুও কারও সঙ্গে কথাবার্তা কন না। বাড়ির বাইরে তাঁকে কখনওই দেখা যায় না। তাই এ বাড়িতে যে কেউ থাকে, এটাই লোকে ভুলতে বসেছে। গভীর রাতে নাকি মাঝে-মাঝে বটুকবাবু বের হন। কোথায় যান, কী করেন, তা কেউ জানে না।

বটুক সামন্তর বাড়িটাও ভারী একটেরে, গাঁ থেকে একটু তফাতে, শিমুল আর জারুল গাছের একটা বনের মতো আছে, তার পিছনে। নিরালা জায়গা। চারদিকে দেড় মানুষ সমান উঁচু মজবুত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত বাগান। ভিতরে পুকুর, পুকুরের ধার ঘেঁষেই পুরনো আমলের লাল রঙের দোতলা একটা বাড়ি। বুড়োবুড়িরা কেউ বেঁচে নেই। বটুক সামন্তর বুড়ি বিধবা এক পিসি কয়েক বছর আগেও বেঁচে ছিলেন। তিনি মরা ইস্তক ও বাড়িতে বটুক সামন্ত আর তাঁর বিচ্ছিরি কুকুরটা আর ভিখুরাম ছাড়া কেউ থাকে না। বাইরের ফটকের কাছে একটা খুপরি ঘরে খুনখুনে বুড়ো দরোয়ান ভিখুরাম থাকে বটে, তবে না থাকার মতোই। ভিখুরাম আগে বাজারহাট করত, এখন বুড়ো হয়েছে, সারাদিন শুয়ে-বসেই থাকে। বাইরে বেরোবার ক্ষমতা নেই। বাজারের ব্যাপারীদের সঙ্গে বটুকবাবুর বন্দোবস্ত আছে। তারা চাল, ডাল আর আনাজপাতি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পয়সা নিয়ে যায়।

বটুকবাবুর এই নিরালা বাড়ির ভিতরে কী হয় না হয়, তা আর কেউ না জানলেও মহিষবাহন টক্কেশ্বর জানে। টক্কেশ্বরের জানারও কিছু কারণ আছে। এক কারণ হল, তার খুব খিদে পায়। যখন-তখন এমন খিদে চাগিয়ে ওঠে যে, টক্কেশ্বরের তখন বক-রাক্ষুসে চেহারা। তবে মোষ চরিয়ে-চরিয়ে গাঁয়ের কোথায় কোন গাছে কোন ফল পাকছে বা ফলছে, তার সব খবর সে জানে। আর জানে, বটুকবাবুর বাগানে কাশীর পেয়ারা, আতা আর নোনা, বেল আর গ্রীষ্মকালে যা আম হয়, তেমনটা আর কোথাও নয়। তার আরও একটা সুবিধে হল, সে মোষের পিঠে ঘুরে বেড়ায়। ফলে, মোষের কাঁধে ভর করে বটুকবাবুর বাগানের পাঁচিলে উঠে পড়া তার কাছে জলভাত। দেওয়াল ঘেঁষেই কিছু গাছ আছে। টক্কেশ্বর নিঃশব্দে কাজ সারতে ভালই জানে। এমনকী, কুকুরটাও সব সময় তার উপস্থিতি বুঝতে পারে না। অবশ্য সব দিন সমান যায় না। এক-একদিন কুকুরটা গন্ধ পেয়ে তেড়েও আসে। টক্কেশ্বর তখন টুক করে তার মোষের পিঠে নেমে পড়ে। কুকুরটা মাঝেমধ্যে তেড়ে এলেও বটুকবাবু কিন্তু কখনও ফিরেও তাকান না। একমনে মাছ ধরেন। কিন্তু একমাত্র টক্কেশ্বরই জানে, বটুকবাবু মাছও ধরেন না। সে কতদিন দেখেছে, বটুকবাবু ছিপে গেঁথে মাছ তুলে এনে মুখ থেকে বঁড়শি ছাড়িয়ে মাছকে আবার জলে ছেড়ে দেন। বটুকবাবু কি বোকা? ছেড়েই যদি দেবেন, তা হলে ধরেন কেন? এইটা অনেক ভেবেও টক্কেশ্বর আজও বুঝতে পারেনি।

টক্কেশ্বর তক্কেতক্কে আছে। একদিন ফাঁক পেলে সে বাগানে নেমে পুকুর থেকে একটা বড়সড় মাছ ধরে নিয়ে যাবে। ধরা শক্তও নয়। সে জানে, বটুকবাবুর পুকুরে মাছ গিজগিজ করছে। ছিপ বা জাল ফেলারও দরকার নেই, জলে নেমে সাপটে ধরে তুলে ফেললেই হয়। কিন্তু ফাঁক পাওয়াই মুশকিল। বটুকবাবু প্রায় সারাদিনই পুকুরপাড়ে বসে থাকেন। বাপ-ঠাকুরদার টাকা ছিল বলে, বটুকবাবুকে কোনও কাজকর্ম করতে হয় না। কিন্তু তা বলে সারাদিন মাছ ধরা আর ছেড়ে দেওয়াটাই বা কী রকম কথা?

বটুকবাবুর পুকুরের মাছের গল্প একদিন সে বাড়িতে করেছিল। তাতে তার ঠাকুরদা বাঘু শিকারি গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "তা তোর ও-বাড়িতে উঁকিঝুঁকি দেওয়ার দরকার কী? খবরদার, আর যাবি না!"

টক্কেশ্বর অবাক হয়ে বলে, "কেন দাদু, গেলে কী হয়?"

বাঘু শিকারি মাথা নেড়ে বললেন, "ও-বাড়িতে না যাওয়াই ভাল। বাড়িটা বন্ধন করা আছে। ভিতরে ঢুকলে বিপদ হতে পারে।"

"বাড়ি বন্ধন করা থাকলে কী হয় দাদু?"

"শুনেছি চোর-ডাকাত নাকি ঢুকতে পারে না। বটুকের ঠাকুরদা মস্ত তান্ত্রিক ছিল। ওরা সব মারণউচাটন জানে। কাজ কী তোর ও-বাড়িতে গিয়ে?"

"আমি তো বটুকবাবুর বাড়ির দেওয়ালে উঠে কত ফলপাকুড় পেড়ে খাই। কিছু হয় না তো!"

"খবরদার, আর ওদিক মাড়াসনি। বটুক বাণ মেরে দিলে শেষ হয়ে যাবি।"

টক্কেশ্বর হেসে বাঁচে না। বটুকবাবু বাণ মারবেন কী? বটুকবাবু তো একটা ভ্যাবলা লোক। যিনি পুকুরের মাছ ধরে-ধরে ছেড়ে দেন, তিনি ভ্যাবলা ছাড়া কী?

কথাটা বাড়িতে বেশ চাউর হওয়াতে টক্কেশ্বরের বাবা আর বড়বাবাও তাকে ডেকে বলে দিলেন, বটুকবাবুর বাড়িতে সে যেন আর না যায়।

টক্কেশ্বরের এটাই হয়েছে মুশকিল। তার বাড়িতে চার পুরুষ বর্তমান। মাথার উপর বাবা, বাবার মাথার উপর ঠাকুরদা, আবার ঠাকুরদার মাথার উপর বড়বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদার বাবা এখনও বেঁচে। এত গার্জেন থাকায় টক্কেশ্বরের একটু অসুবিধে হয়। কিন্তু বটুকবাবুর বাড়িতে কী এমন জুজু আছে, সেটাই সে বুঝতে পারে না।

আর সেই জন্যই সে আরও বেশি করে ব্যাপারটা জানার জন্য উচাটন হয়। সে বীরপুরের বিখ্যাত বাসুলি মন্দিরের পুরুতঠাকুর পীতাম্বর ভট্টাচার্যের কাছেও গিয়েছিল।

"ঠাকুরমশাই, বাড়ি বন্ধন করা থাকলে কী হয়?"

পীতাম্বর মুখটা আঁশটে করে বললেন, "বন্ধন করলে চোর-ডাকাত আসে না, বদমাশরা তফাত থাকে।"

"সত্যি ঠাকুরমশাই?"

"সত্যি না মিথ্যে তা কী করে বলি বলো তো বাপু! কলিকালে কি আর মন্তরতন্তরের সেই জোর আছে? আমি তো আমার বাগানখানা শতেকবার বন্ধন করেছি। তাতে কি কিছু হল? রোজ গোরু-ছাগল ঢুকে গাছপাতা খেয়ে যাচ্ছে। মুলোটা, লাউটা চুরিও যাচ্ছে রোজ।"

"তবে যে শুনি বটুকবাবুর বাড়ি নাকি বন্ধন করা আছে। সেখানে ঢুকলে বিপদ হবে!"

পীতাম্বর বিরস মুখে বললেন, "বটুকের ঠাকুরদা তন্তরমন্তর জানত বটে। তা বন্ধন করে কোন কচুটা হল? বংশই তো লোপাট হতে বসেছে। বটুকটা তো সংসারধর্মই করল না, বারদুই বিবাগী হয়ে ফের ফিরে এসে বাড়িতে থানা গেড়ে বসে আছে। তবে ওর আর বাড়ি বন্ধনের দরকারটাই বা কী? যা একখানা সড়ালে কুকুর পুষেছে, তাতেই তো চোর-ছ্যাঁচড়রা তফাত থাকে। কলিকাল তো, তাই মন্তরে তেমন কাজ হয় না, বুঝলি? কুকুর পুষলে বেশি কাজ হয়। তা তোর মতলবটা কী বল তো, হঠাৎ বটুকের এত খতেন নিচ্ছিস কেন?"

টক্কেশ্বর একগাল হেসে বলল, "কী জানেন ঠাকুরমশাই, বটুকবাবুর পুকুরে একেবারে গিজগিজ করছে বড়-বড় মাছ। তাই ভাবছিলাম, অত মাছ তো আর বটুকবাবুর ভোগে লাগবে না। এক-আধটা যদি চুপিচুপি

গিয়ে তুলে আনি!"

পীতাম্বরের চোখ চকচক করে উঠল। একমুখ হাসি নিয়ে বললেন, "ওরে, শাস্ত্রেই আছে, বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ং। তাতে চুরির দোষও অর্শাবে না। তা তুলবি বাবা? সত্যি?"

"তাই তো ইচ্ছে ঠাকুরমশাই।"

"তা তুলিস। মুড়োটা বরং ব্রাহ্মণভোজনে দিয়ে যাস।"

"তাই হবে ঠাকুরমশাই!"

মাছ চুরির মতলব আঁটলেও চট করে কাজে নামতে ঠিক সাহস হয়নি টক্কেশ্বরের। কারণ, বটুকবাবু লোকটা কেমন, সেটাই আন্দাজ করতে পারছে না সে। যারা কম কথা কয়, যারা গোমড়ামুখো, তাদের টক করে বোঝা যায় না কিনা! গাঁয়ের লোকও বটুককে চেনে বটে, কিন্তু তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই জানে না। ধরা পড়লে টক্কেশ্বরকে বটুকবাবু পেটাবেন না কোতল করবেন না ছেড়ে দেবেন, সেটাও আঁচ করতে পারছিল না সে। তবে মতলবটা মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক'দিন ধরে।

আজ সকালে কোবরেজমশাই এসে উঠোনে বসে বড়বাবার নাড়ি দেখছেন। অখণ্ড মনোযোগ, চোখ বন্ধ, ধ্যানস্থ, তা কোবরেজমশাইয়ের বয়সও কিছু কম হল না। একশো বারো পেরিয়ে তেরো। বড়বাবা, অর্থাৎ হাবু শিকারির এই একশো তেরো পেরিয়ে চোদ্দ। অনেক সময়ই দেখা যায়, নাড়ি দেখতে-দেখতে কোবরেজমশাই আর হাবু শিকারি দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আজও প্রায় সেই পরিস্থিতি। প্রায় আধঘণ্টা নাড়ি দেখার পর কোবরেজমশাই হঠাৎ টান হয়ে বসে বললেন, "নাঃ, শরীরে তো কোনও আবল্যি নেই হে। লক্ষণ সবই বেশ ভাল।"

হাবু শিকারি মিটমিট করে চেয়ে বললেন, "তা হলে খিদেটা হচ্ছে না কেন বলো তো! সকাল থেকেই পেটটা যেন ভরা-ভরা।"

টক্কেশ্বরের ঠাকুরমা ঘোমটার আড়াল থেকে বললেন, "তা খিদের আর দোষ কী? ফাঁক পেলে তো খিদে হবে? সকালে উঠে একগোছা রুটি খেয়েছেন। ঘণ্টাটাক পরেই এক কাঁসি ফেনাভাত, পেট তো ফুরসতই পাচ্ছে না!"

কোবরেজমশাই দু' ধারে ঘনঘন মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, উঁহু, এ তো মোটেই ভাল কথা নয় হে হাবু। বয়স হয়েছে, একথাটা মনে রেখো। এ বয়সে সংযম পালন না করলে যে ফ্যাসাদে পড়বে!"

হাবু শিকারি খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "রাখো, রাখো, বলি তোমার বয়সটাও কি কম হল? এই তো সদানন্দের মেয়ের বিয়েতে সেদিন বারোটা মাছ আর পঁচিশটা রসগোল্লা খেলে! আমার অত খাই-খাই নেই বাপু। সেদিন আমি মোটে দশখানা মাছ আর কুড়িটা রসগোল্লা খেলুম।"

"আর মিছে কথাগুলো বোলো না তো হাবু। দশ টুকরো মাছ খেলে কী হয়! সেই সঙ্গে যে এককাঁড়ি মাংস সাঁটালে! এই তো বউমা বলল, সকালে একগোছা রুটি খেয়েছ, তারপর ফেনাভাত, তবে খিদের অভাব হচ্ছে কোথায়?"

হাবু একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলেন, "খেয়েছি নাকি? তা হবে হয়তো! আগে ভাল-মন্দ কিছু খেলে বেশ মনে থাকত। আজকাল মোটেই মনে থাকছে না কেন বলো তো?"

"সেটা মোটেই ভাল-মন্দের দোষ নয়, তোমার নোলার দোষ।"

হাবু শিকারি মাথা নেড়ে বলেন, "তা নয় হে কোবরেজ। আসলে ভাল-মন্দ কিছু জুটছে না বলেই মনে থাকছে না। রুটি আর ফেনাভাত কি ভাল-মন্দের মধ্যে পড়ে? ওসব ভুসিমাল খেয়ে-খেয়েই আমার অরুচিটা হয়েছে।"

"তা বলে রোজ মাংস-পোলাও খেতে চাও নাকি?"

"আহা, মাঝেমধ্যে হতে দোষ কী বলো! রোজ-রোজ গুচ্ছের ফেনাভাত, রুটি, শাকপাতা খেয়ে যে গায়ে মোটেই জোর হচ্ছে না। একটু ভাল পথ্যির নিদান দিয়ে যাও দিকিনি। এই ধরো, পাকা মাছ, মাংসের সুরুয়া, ঘন দুধ।"

"সেসব আর কোথায় পাবে বলো। যা জুটছে তাই ভগবানের দয়া বলে মনে কোরো।"

বুড়ো বয়সে বড়বাবামশাইয়ের একটু নোলা হয়েছে, একথা ঠিক। এ-বাড়িতে শাকপাতা, কচুঘেঁচু ছাড়া ভাল-মন্দ বড় একটা হয় না। বড়জোর কুচোমাছ। তাই বড়বাবামশাইয়ের জন্য বড় কষ্ট হয় টক্কেশ্বরের। একশো চোদ্দ বছর বয়স মানুষটার, ক'দিনই বা আর আছেন। তাই টক্কেশ্বর ঠিক করল, এসপার-ওসপার যাই হোক, আজ বটুকবাবুর পুকুর থেকে একটা মাছ তুলে আনবে।

মোষ চরাতে বেরিয়ে আজও টক্কেশ্বর বটুকবাবুর বাড়ির দেওয়ালে উঠল। জালের তৈরি একটা থলি এনেছে সে। ফাঁক বুঝে মাছ ধরে কাঁধে ঝুলিয়ে নেবে। তারপর তাড়াতাড়ি গাছে উঠে দেওয়াল ডিঙিয়ে এ-পাশে নেমে পড়বে।

কপালটা ভালই বলতে হবে তার। আজ দেওয়ালে উঠে দেখতে পেল, পুকুরের ধারে বটুকবাবুর জায়গাটা ফাঁকা। কেউ নেই। টক্কেশ্বর খুব সাবধানে ভাল করে চারধারটা দেখে নিল। না, বাগানে কোথাও বটুকবাবুকে দেখা যাচ্ছে না। কুকুরটারও হদিশ নেই। টক্কেশ্বর খুব ভাল করে চারধার দেখে নিয়ে মনে-মনে একটা হিসেব করল। গাছ বেয়ে পুকুরের কাছাকাছি গিয়ে যদি ঝপ করে নামা যায়, তা হলে মাছ ধরতে দু' মিনিটের বেশি লাগবে না। মাছসুদ্ধ গাছে ওঠা একটু কঠিন হবে বটে, কিন্তু পারা যাবে। একবার গাছে উঠে পড়তে পারলে আর চিন্তা নেই। সে বাঁদরের মতো গাছ বাইতে পারে।

সাহস করে সে সামনের গাছের ডালে উঠে সাবধানে এগোতে লাগল। শব্দটব্দ যাতে না হয়, তার জন্য খুব ধীরে-ধীরে আড়া ডাল বেছে-বেছে এগোতে লাগল। এ-কাজটা শক্ত নয়। আসল শক্ত কাজটা হল, নেমে ঝপ করে মাছ তুলে তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়া। খুব বড় মাছ হলে অবশ্য বিপদে পড়তে হবে। তার ইচ্ছে, মাঝারি আট-দশ কেজি ওজনের একটা মাছ ধরা। কিন্তু তাড়াহুড়োয় বাছাবাছির সময় তো থাকবে না। সেইটেই বিপদের কথা।

পুকুরের কাছ বরাবর চলে এল টক্কেশ্বর। নামার জন্য ঝুল খেতে পা নামিয়েও সে শেষবার চারদিকটা নিরখ-পরখ করার জন্য এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে আচমকা আপাদমস্তক শিউরে উঠল। পুকুরের দক্ষিণ দিকে একটা ঝোপের সামনে ফুটফুটে একটা আট-দশ বছরের মেয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে নীল রঙের ফ্রক, পায়ে জুতো-মোজা, সুন্দর করে চুল আঁচড়ানো, তাতে আবার কালো রিবন। হাসি-হাসি মুখ করে মেয়েটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টক্কেশ্বর এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, আর-একটু হলে তার শিথিল হাত গাছের ডাল থেকে ফসকে যেত। কোনওরকমে গাছের ডালটা ধরে পা দু'টো উপরে তুলে আড়াল হল সে। বটুকবাবুর বাড়িতে কোনও বাচ্চা মেয়ে নেই, থাকার কথাও নয়। তা হলে কি এতদিন বাদে এ-বাড়িতে বটুক সামন্তর কোনও আত্মীয়স্বজন এসেছে? তাই হবে হয়তো। নইলে বটুকবাবুর বাড়িতে খুনিয়া কুকুর আছে জেনেও কোনও বাচ্চা মেয়ে কি ঢুকতে সাহস করবে? মেয়েটা একা অত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই বা আছে কেন, তাও বুঝতে পারছিল না টক্কেশ্বর। সে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না টক্কেশ্বরকে। আচমকা কোথায় একটা কীসের শব্দ হল। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুতের গতিতে আর-একটা ঝোপের আড়াল থেকে মস্ত কুকুরটা বেরিয়ে এল।

চোখের পলক ফেলার সময় পেল না টক্কেশ্বর। কুকুরটা সোজা মেয়েটার দিকে ছুটে এসে একটু দূর থেকে একটা লাফ দিয়ে পড়েই মেয়েটার গলা কামড়ে ধরে চিত করে ফেলে দিল মাটিতে। তার ঝটকা মেরে-মেরে ছিঁড়তে লাগল গলার নলি।

আতঙ্কে চিৎকার করেছিল টক্কেশ্বর। কিন্তু তার ভাগ্য ভাল, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়নি। চোখ বুজে ফেলেছিল সে। এরকম ভয়ংকর

দৃশ্য সে জীবনে দ্যাখেনি। আতঙ্কে হিম হয়ে গিয়েছে তার শরীর। কাঠ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে আর-একটা শিসের শব্দ শুনে চোখ চাইল। দেখল কুকুরটা মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে ফের যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে ফিরে গেল। টক্কেশ্বর দেখল, মেয়েটা স্থির হয়ে পড়ে আছে। নড়ছে না। কুকুরটা যখন তেড়ে আসছিল, তখনও মেয়েটা নড়েনি বা পালানোর চেষ্টা করেনি বা চেঁচায়নি। এটা ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হল টক্কেশ্বরের।

কিছু করার নেই বলে গাছেই বসে রইল টক্কেশ্বর। একটু বাদে দেখা গেল, বটুকবাবু খুব ক্লান্ত মুখে ধীরেসুস্থে হেঁটে এসে মেয়েটাকে তুলে দাঁড় করিয়ে কিছু দেখলেন মন দিয়ে। মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। আর টক্কেশ্বর খুব অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটার গলায় একটা মস্ত গর্ত হয়ে গেলেও একটুও রক্ত পড়ছে না। ভাল করে দেখে টক্কেশ্বর বুঝল, ওটা কোনও মেয়ে নয়। একটা পুতুল। তবে বেশ বড়সড় পুতুল।

কিন্তু পুতুলটার উপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার অর্থ কী? ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারল না টক্কেশ্বর। তবে নিজের ভাগ্যকে সে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যিস আহাম্মকের মতো মাছ ধরতে নেমে পড়েনি!

বটুকবাবু পুতুলটা তুলে নিয়ে ধীরেসুস্থে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। পিছন-পিছন তাঁর কুকুরটাও।

টক্কেশ্বর ধীরে-ধীরে গাছের ডাল বেয়ে-বেয়ে ফিরে এল। তারপর পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। কিন্তু মনে বড্ড খটকা লেগে আছে। ব্যাপারটা কী হল, কেন হল, তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। একটা পুতুলের উপর তো কারও কোনও আক্রোশ থাকতে পারে না! বড্ড চিন্তায় পড়ে গিয়ে টক্কেশ্বর ভারী আনমনা রইল সারা দিনমান।

বটুকবাবুর বাড়ি যেসব ব্যাপারীরা চাল, ডাল, তেল, মশলা আর আনাজ পৌঁছে দেয়, তাদের সবাইকেই চেনে টক্কেশ্বর। বীরপুর বাজারের গোপাল পুরকাইত তাদের একজন। তার বেশ বড় মুদিখানার দোকান। টক্কেশ্বরের সঙ্গে ভাবসাব আছে। কারণ, গোপালের আবার মোষের দুধ ছাড়া চলে না আর টক্কেশ্বরের বাড়ি থেকে সেই মোষের দুধ যায়।

সন্ধেবেলা টক্কেশ্বর গিয়ে গোপাল পুরকাইতের দোকানে হানা দিল। দোকানে ভিড়ভাট্টা নেই। দু'-চারজন বসে আছে বটে, তবে তারা খদ্দের নয়। গল্পসল্প করতে আসে। গোপাল বসে খাতায় বিকিকিনির হিসেব টুকে রাখছিল। তাকে দেখে বলল, "কী খবর রে, টক্কা?"

টক্কেশ্বর মাথাটাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে, একটা ব্যাপার জানতে এলাম খুড়োমশাই।"

"কী ব্যাপার?"

"আজ একটা ব্যাপার দেখে মনে বড় খটকা লাগছে।"

"বলে ফ্যাল।"

"আজ দেখলাম বটুকবাবু তাঁর শিকারি কুকুরটাকে একটা মেয়ে পুতুলের উপর লেলিয়ে দিলেন। কুকুরটা গিয়ে পুতুলটার গলার নলি ছিঁড়ে ফেলল। পুতুলটা কিন্তু ভারী সুন্দর আর প্রমাণ সাইজের।"

ওটা পুতুল নয় রে, ওকে বলে ম্যানিকুইন। পোশাকের দোকানে সাজিয়ে রাখে শো-কেসে। তা তুই আবার বটুকবাবুর বাড়িতে ঢুকতে গেলি কেন? প্রাণের ভয় নেই! ও যা কুকুর, এক কামড়ে শেষ করে দেবে যে!"

"বাড়িতে ঢুকিনি খুড়োমশাই, দেওয়ালের উপর দিয়ে একটু উঁকি দিয়ে বাগানটা দেখছিলুম। তখনই এই ব্যাপার। তাই ভাবলাম, ব্যাপারটা কী হল, তা আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করে যাই।"

"বাড়িতে উঁকিঝুঁকি দেওয়া বটুকবাবু কিন্তু পছন্দ করেন না। আর ও া দেখেছিস, তা তেমন কিছু নয়। ভাল জাতের কুকুর তো, তাই ধ হয় মাঝে-মাঝে ট্রেনিং দিয়ে রাখেন।"

এবার জলের মতো বুঝতে পারল টক্কেশ্বর। একগাল হেসে বলল, তাই হবে বোধ হয়। আমার কেমন খটকা লেগেছিল বলে আপনার কাছে জানতে এলুম।"

টক্কেশ্বর যখন চলে আসছিল তখন দোকানে বসা লোকদের মধ্যে একজন তার পিছু নিয়ে এসে ধরে ফেলল, "বলি ও টক্কেশ্বর, একটু কথা ছিল যে!"

টক্কেশ্বর লোকটাকে চেনে। গোরাং দাস। গোরাং দাস ভিক্ষে করে বটে, কিন্তু তাকে কেউ ভিখিরি বলে মোটেই মনে করে না। বরং যেখানে যায়, সেখানেই গোরাং খাতির পায়।

"কী কথা গোরাংদা?"

"ঘটনাটা একটু খোলসা করে বলবি ভাই?"

তা বলল টক্কেশ্বর, এমনকী মাছ চুরির মতলবের কথাও চেপে রাখল না।

সব শুনে গোরাং বলল, "বটুকবাবু তোকে দেখতে পায়নি তো?"

"না। আমি তো গাছের উপর ছিলুম।"

"কথাটা পাঁচকান করতে যাস না। তোর বিপদ হতে পারে।"

টক্কেশ্বর অবাক হয়ে বলে, "আমার বিপদ হবে কেন?"

"তা জানি না। আরও একটা কথা।"

"কী কথা গোরাংদা?"

"আর ভুলেও বটুকবাবুর পুকুরের মাছ ধরার মতলব করিস না। আজ বরাতজোরে বেঁচে গেছিস বটে, কিন্তু রোজ-রোজ তো বরাত তোকে দেখবে না।"

"তা বটে। কিন্তু পুকুরে যে অনেক মাছ গো গোরাংদা। কিলবিল করছে যে!"

"শোন বোকা, বটুকবাবু কুকুরের মতো ওই মাছগুলোকেও পোষে। কখনও নিজের পুকুরের মাছ খায় না, বাজারের মাছের ব্যাপারী যোগেন রোজ মাছ পৌঁছে দিয়ে আসে। বুঝলি কিছু? পুকুরের মাছে হাত পড়লে কিন্তু বিপদ আছে।"

"বুঝেছি গোরাংদা।"

টক্কেশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোরাং পা চালিয়ে চরণডাঙার দিকে হাঁটা দিল। তার মনে হচ্ছে, আর বিশেষ সময় নেই। তাড়াতাড়ি না করলে কী থেকে কী হয়ে যায় কে জানে বাবা! তবে তার মনটা বড় কু গাইছে।

॥ ৫ ॥

দুপুর দেড়টা বেজে যাওয়ার পরও যখন প্রাণগোবিন্দবাবু ফিরলেন না তখন সুরবালা খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। বুড়ো হয়েছেন, তার উপর আলাভোলা মানুষ, কোথায় কী হল কে জানে! দুশ্চিন্তায় বারবার ঘড়ি দেখছেন আর ঘর-বার করছেন। শেষ অবধি পুলিশে খবর দিতে হবে কিনা তাও ভাবছেন। ঠিক এমন সময় একটা চাষাভুষো চেহারার লোক এল। একমুখ দাড়িগোঁফ, মাথায় একটা গামছা বাঁধা। গায়ে তুষের চাদর। বলল, "আজ্ঞে, বাবু পাঠালেন।"

সুরবালা ঝেঁঝেঁ উঠে বললেন, "তা বাবুটি কোথায়?"

লোকটা জবাব না দিয়ে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে সুরবালার হাতে দিয়ে বলল, "আজ্ঞে, এতে সব লেখা আছে।"

সুরবালা তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে পড়লেন। পেনসিলে লেখা,

কল্যাণীয়াসু, জরুরি কাজে বাহির হইয়াছি। একটা ভাল শিকারের সন্ধান আসিয়াছে। বেশ মোটা টাকা আদায় হইবে বলিয়া মনে হয়। এরূপ চলিতে থাকিলে অচিরেই কয়েক লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা। চিন্তা করিও না। ফিরিতে বিলম্ব হইবে।

ইতি

প্রাণগোবিন্দ রায়

সুরবালা চিঠি পড়ে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

পাশ থেকে সরু গলায় পিউ জিজ্ঞেস করল, "দাদু কী লিখেছেন ঠাকুরমা?"

সুরবালা নাতনির দিকে রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে বললেন,

"তোমার দাদু অধঃপাতে গেছে ভাই। ছিঃ ছিঃ, বুড়ো বয়সে যে কারও এমন মতিচ্ছন্ন হয়, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।"

পিউ চিঠিটা ঠাকুরমার হাত থেকে নিয়ে পড়তে লাগল।

সুরবালা লোকটাকে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাবুটি এখন কোথায় বলতে পার?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে না। তবে বীরপুরের দিকেই গেলেন মনে হল।"

"বীরপুর! সেটা আবার কোথায়?"

"বেশি দূর নয় মা-ঠাকরুণ। আপনাদের ছাদে উঠে উত্তর দিকে চাইলে বীরপুরের বাসুলি মন্দিরের চুড়ো দেখা যায়। মাইলটাকও হবে না।"

"তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হল?"

"আজ্ঞে, মাঠে কাজ করছিলাম, বাবু আল ধরে হনহন করে যাচ্ছিলেন। আমাকে ডেকে চিঠি আর পাঁচটা টাকা দিলেন। বললেন, জরুরি কাজে যাচ্ছেন, চিঠিটা যেন পৌঁছে দিই। তা হলে বিদেয় হই মা-ঠাকরুণ? হাল-গোরু সব মাঠে ছেড়ে এসেছি কিনা।"

লোকটার কাছ থেকে আর কোনও খবর পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে সুরবালা বললেন, "যাও, কিন্তু যদি বাবুর দেখা পাও তো বোলো, যেন এক্ষুনি বাড়িতে ফিরে আসে। বাড়িতে সবাই খুব চিন্তা করছে।"

লোকটা ঘাড় কাত করে বলল, "যে আজ্ঞে।"

একটু যেন জোর কদমেই চলে গেল লোকটা।

চিঠিটা কষ্ট করে পড়তে-পড়তে পিউ হঠাৎ বলল," ঠাকুরমা, দাদু কি বাংলা লিখতে পারে?"

এ-কথায় সুরবালা খুব আতান্তরে পড়ে গেলেন। প্রাণগোবিন্দর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে তাঁরা কখনও পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকেননি। কাজেই প্রাণগোবিন্দ কখনও চিঠিপত্রও লেখেননি সুরবালাকে।

সুরবালা বললেন, "তা পারবে না কেন? পঞ্জিকাটঞ্জিকা তো পড়ে।"

পিউ মাথা নেড়ে বলে, "দাদু পঞ্জিকাও পড়তে পারে না। খুব ঠেকে-ঠেকে পড়ে। আর সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, 'ঠ'-এর টিকিটা ডান দিকে না বাঁ দিকে। একটুআধটু পড়তে পারলেও দাদু কিন্তু বাংলা লিখতে পারে না। কী করেই বা পারবে বলো, দাদু তো দেরাদুনে মানুষ!"

সুরবালা ভেবে দেখলেন, কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বাস্তবিক, প্রাণগোবিন্দরা বরাবর দেরাদুনে থেকেছেন। প্রাণগোবিন্দকে তিনি বরাবর ইংরেজিতেই লেখাপড়া করতে দেখেছেন। বাংলা লিখতে দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। প্রাণগোবিন্দর বাংলা হাতের লেখাও তিনি চেনেন না।

চিঠিটা নিয়ে ভাল করে দেখলেন সুরবালা। মেয়েলি ছাঁচের গোটা-গোটা লেখা। পেনসিলে লেখা বলে যেন আবছাও।

"তুই দাদুর হাতের লেখা চিনিস?"

"ইংরেজি হাতের লেখা চিনি।"

সুরবালা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, "ধরে-ধরে লিখেছে, ও তোর দাদুরই হাতের লেখা। তা ছাড়া আর কে চিঠি পাঠাবে?"

"দাদু আসবে না ঠাকুরমা?"

"তার কি আর বাড়ির দিকে মন আছে রে! তাকে ভূতে পেয়েছে।"

উদ্বেগটা একটু কমল বটে, কিন্তু মনটা শান্ত হল না। ওরকম শান্তশিষ্ট, নিরীহ, সজ্জন একজন মানুষ হঠাৎ এরকম হন্যে হয়ে উঠল কেন, তা যেন কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না! এতকাল ঘর করেও তিনি কি সত্যিই প্রাণগোবিন্দকে একটুও চিনতে পারেননি?

হলধরকে ডেকে সুরবালা জিজ্ঞেস করলেন," হ্যাঁ রে হলধর, বীরপুর গ্রামটা চিনিস?"

হলধর অবাক হয় বলে, "তা চিনব না! এই তো এক দৌড়ের রাস্তা।"

"তা সেখানে কী আছে বল তো!"

"তা সে অনেক কিছু আছে। বাসুলি মন্দিরের কথা তো সবাই জানে, ভারী জাগ্রত দেবতা। তারপর ধরুন, খালধারে এখন শিবরাত্তির মেলাও চলছে। এই এক-দেড়মাস ধরে চলে। খুব বড় মেলা। সার্কাসের তাঁবুটাবুও পড়েছে দেখে এসেছি।"

"যেতে কতক্ষণ লাগে?"

হেসে গ্যালগ্যালে হয়ে মাথা নেড়ে হলধর বলে, "সে মোটে দূরই নয়। নসিগঞ্জের গা-ঘেঁষেই বীরপুর। কালু শেখ একখানা বিড়ি ধরিয়ে নসিগঞ্জ থেকে হাঁটা দেয়। সেই বিড়ি বীরপুরে গিয়ে শেষ হয়। ছাদে উঠে উত্তর দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন, বীরপুরের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। কেন মা, যাবেন নাকি? গেলে বলুন, ভ্যানগাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসি। দশ মিনিটে পৌঁছে দেবে।"

"তুই যাবি বাবা? গিয়ে লোকটাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবি?"

মাথা চুলকে হলধর বলে, "কর্তাবাবু কি বীরপুরে গেলেন নাকি মা?"

"সেরকমই তো শুনছি। একবার যা না বাবা।"

পিউ বলল, "আমিও যাব ঠাকুরমা! আমি ঠিক দাদুকে ধরে আনব।"

সুরবালা মাথা নেড়ে বললেন, "না ভাই, তোমার গিয়ে কাজ নেই। ওসব গন্ডগোলের মধ্যে তোমার না যাওয়াই ভাল। হলধর গিয়ে আগে মানুষটার খবর আনুক। পরে দরকার হলে আমরা সবাই যাব।"

পিউ আর কিছু বলল না। চুপটি করে সিঁড়ি বেয়ে ছাদের উপর উঠে এল। তারপর রেলিং ধরে বীরপুরের দিকে চেয়ে রইল। অনেক গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে একটা মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। আর কিছু বাড়িঘর। সামনে একটা প্রকাণ্ড খেত, কিছু ঝোপঝাড়। না, বীরপুর খুব দূরে নয়। পিউ দেখতে পেল, আকাশে একটা সাদা রঙের ঘুড়ি উড়ছে। মস্ত বড় ঘুড়ি। কিছুক্ষণ ঘুড়িটার দিকে চেয়ে থেকে সে এসে চিলেকোঠার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল। চুপচাপ বসে অনেকক্ষণ ভাবল সে। ঠাকুরমার কথাগুলো সে বুঝতে পারেনি। দাদু একটা কোনও দুষ্টুমি করেছেন নাকি? কিন্তু তার দাদু তো ভীষণ ভুলোমনের মানুষ, দুষ্টুমি করবেনই বা কী করে? এসবই খুব ভাবছে সে। ভাবতে-ভাবতে চকোলেটের মোড়কটা খুলে চিরকুটটা বের করল। তাদের কী বিপদ হবে তাও সে বুঝতে পারছে না।

চিরকুটটা খুলে ভারী অবাক হয়ে গেল পিউ। সকালেও চিরকুটটাতে পেনসিলের লেখাটা ছিল। কিন্তু এখন নেই তো! চিরকুটটা তো একদম সাদা! লেখাটা কী করে ভ্যানিশ হয়ে গেল? এটাও কি ম্যাজিক?

হঠাৎ তার মনে হল চিরকুটে যে লেখাটা ছিল, সেটার সঙ্গে ঠাকুরমাকে লেখা দাদুর চিঠির হাতের লেখাটা অনেকটা একরকমের। গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা। মনে হতেই পিউ সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে বারান্দার টেবিলে পড়ে-থাকা দাদুর চিঠিটা নিয়ে ফের ছাদে উঠে এল। চিঠিটা খুলে দেখল, পেনসিলের লেখাটা অনেকটাই আবছা হয়ে গিয়েছে। কোনও-কোনও অক্ষর মুছেও গিয়েছে।

পিউ কিছু বুঝতে না পেরে ভারী অবাক হয়ে বসে রইল। ম্যাজিশিয়ান বিক্রমজিৎ-এর চিঠির সঙ্গে দাদুর চিঠির হাতের লেখা একরকম হবে কেন?

খুবই অন্যমনস্ক ছিল পিউ। হঠাৎ ঠক করে একটা শব্দ হওয়ায় চোখ তুলে দেখল, সাদা ঘুড়িটা তাদের ছাদে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পিউ তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুড়িটা কুড়িয়ে নিল। চারদিকে চেয়ে ঘুড়িটা কে ওড়াচ্ছে, তা দেখতে পেল না। সুতো টেনে দেখল, ঘুড়িটা ভো-কাট্টা হয়ে উড়ে এসে পড়েনি। ভো-কাট্টা হলে সুতো ছেড়ে আসত। ঘুড়িটা ফের উড়িয়ে দিবে কিনা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল, ঘুড়ির

গায়ে কী যেন লেখা আছে। পেনসিলের লেখা। ঠিক একই রকম গোটা-গোটা হরফে। লেখা আছে,

'বীরপুরে এখন একশো মজা। খেলনার দোকান, পুতুলনাচ, কাচের চুড়ি, ম্যাজিক, সার্কাস, নাটক, মোচার চপ, মাংসের ঘুগনি কী চাই? দাদু এখানে। ছুটে চলে এসো।

পিউ ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। অন্য কিছু নয়, তার ভীষণ দাদুর কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। তার অমন ভাল দাদুটা নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছেন। পিউ সে কথা মোটেই বিশ্বাস করে না। দাদু কক্ষনো খারাপ হতে পারেন না। সে গিয়ে দাদুকে ঠিক নিয়ে আসবে।

॥ ৬ ॥

সন্ধে-রাত্তিরে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে ভিতরে বসে হিসেব সেরে রাখছিল গোপাল পুরকাইত। এমন সময় দোকানের দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হল।

"কে?"

"এই আমরা, কিছু মালপত্র নিতে এসেছি।"

"কী মাল?"

"পাইকিরি মালই নেব হে। দশ-বিশ বস্তা চাল-ডাল।"

গোপাল শশব্যস্তে উঠে দরজা খুলে দিল। বড় খদ্দের।

দু'জন মুশকো চেহারার লোক দোকানে ঢুকল। একজন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "ব্যস্ত হোয়ো না গোপাল, কথা আছে।"

গোপাল পরিস্থিতিটা ভাল বলে মনে করল না। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "কী চাই তোমাদের? আমি কিন্তু..."

প্রথমজন হাত তুলে তাকে থামিয়ে বলল, " বলেছি তো, কথা আছে। চুপ করে বোসো।"

গোপাল ফ্যাকাসে মুখে তার নিচু তক্তপোশে বসল।

প্রথম লোকটা বলল, " কারবার কেমন চলছে গোপাল?"

গোপাল বলল, "কোনওরকমে চলে। লুটপাট করতে এসে থাকলে কিন্তু লাভ হবে না। সামান্য ব্যবসা আমার।"

"তোমার মতো ছোটখাটো ব্যাপারীর গদি লুঠ করে কি মানমর্যাদা খোয়াব? আমরা গোকুল বিশ্বাসের লোক।"

গোপাল প্রমাদ গুনল। "গোকুল বিশ্বাস!"

"চেনো তাকে?"

গোপাল ঘাড় নেড়ে বলল, "কে না চেনে?"

"আমরা ছোটখাটো কাজ করি না।"

গোপাল চুপ করে রইল।

"এখন যা বলছি, খুব মন দিয়ে শোনো। তারপর ঠিকঠাক জবাব দাও।"

গোপাল এই শীতেও ঘামতে লাগল।

গোকুল বিশ্বাসের একটা আদরের গোরু আছে, জানো? দুধের মতো সাদা রং, বাঁ দিকের দাবনায় ত্রিশূলের ছাপ। খুব সুলক্ষণা গোরু। জানো?"

"না তো!"

"মিথ্যে কথা বলে কিন্তু পার পাবে না। পেট থেকে কথা টেনে বের করতে আমরা জানি। তা সেসব আসুরিক ব্যাপারের দরকার আছে কি?"

গোপাল বিবর্ণ হয়ে বলল, "জানি।"

"ঠিক দু'দিন আগে মাঠ থেকে গোরুটা চুরি যায়।"

গোপাল একটু গলাখাঁকারি দিয়ে কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

"আদরের গোরুটা চুরি হয়ে যাওয়ায় গোকুল বিশ্বাস খুব ভেঙে পড়ে। শুধু আদরেরই নয়, গোরুটা ভীষণ পয়া। ওই গোরুটা আসার পর থেকেই গোকুল বিশ্বাসের ব্যবসা দ্বিগুণ হয়েছে। এসব খবর আশপাশের গাঁয়ে সবাই জানে। তুমি জানো না, এ তো হতে পারে না। কী বলো?"

"শুনেছি।"

"বেশ কথা। এবার খুব ভেবেচিন্তে আমার কথার জবাব দিও।"

গোপাল অস্বস্তি বোধ করছে। উসখুস করে বলল, "কী জানতে চাও?"

"গোরুটা কে চুরি করেছিল?"

"তা কি আমার জানার কথা?"

"তুমি ছাড়া আর কে জানবে?"

গোপাল সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, "বিশ্বাস করো, আমি জানি না।"

"শোনো গোপাল, তোমার চার ছেলে আর গোটাচারেক কর্মচারী আছে। অন্য সব কাজের লোকও আছে। লোকবলের অভাব নেই। তাদের সব ক'জনকে যদি ধরে একে-একে পেটানো হয়, তা হলে সত্যি কথাটা বেরোতে দেরি হবে না। সবার আগে কিন্তু তোমার চার ছেলেকে পেটাই করা হবে। আমাদের দিয়ে অত মেহনত করাবে কেন?"

গোপাল ভয় পেয়ে আমতা-আমতা করে বলল, "যে চুরি করেছে তার দোষ নেই। সে হুকুম তামিল করেছে বই তো নয়।"

"লোকটা কে?"

"আমার ছেলে জয়চাঁদ।"

"আর গোকুল বিশ্বাসের জানালায় টোকা দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার হুকুমনামা জারি করে এসেছিল কে? সেও কি জয়চাঁদ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তার দোষ নেই।"

"দোষের কথা তো হচ্ছে না। আমরা সত্যি কথাটা জানতে চাইছি।"

গোপাল কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "দ্যাখো ভাই, আমি সাতে-পাঁচে থাকি না। খোঁজ নিলেই দেখবে, আমার ছেলেরাও কেউ খারাপ নয়। তাদের কোনও বদনামও নেই। জয়চাঁদ একটু ডাকাবুকো বটে, কিন্তু কক্ষনো কোনও খারাপ কাজ সে করে না।"

"জয়চাঁদের কপালের বাঁ দিকে একটা আব আছে, না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু, যা হয়েছে তার জন্য আমি নাকে খত দিতে রাজি। আমার ছেলেটাকে প্রাণে মেরো না।"

"তুমি তা হলে বলতে চাও জয়চাঁদ নির্দোষ?"

"একেবারে নির্দোষ।"

"তা হলে কি ধরে নেব, গোরু চুরি করা বা মুক্তিপণ আদায় করা এগুলো কোনও দোষের মধ্যে পড়ে না?"

"তা বলিনি।"

"তবে কী বলছ?"

"যা করেছে তা মতলব এঁটে করেনি। ওই যে বললাম, হুকুম তামিল না করে উপায় ছিল না। মুক্তিপণ তো আর নিজের জন্য চায়নি।"

"কার জন্য চেয়েছিল?"

"প্রাণগোবিন্দ রায়ের জন্য।"

"হুকুমটা কি প্রাণগোবিন্দবাবুই দিয়েছিলেন?"

"এ ব্যাপারে আমার কিছু বলা বারণ।"

"ঠিক আছে, বোলো না। আমরা জয়চাঁদকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। যা বলার সে-ই বলবে।"

বলেই উঠতে যাচ্ছিল তারা।

গোপাল আঁতকে উঠে বলল, "দাঁড়াও, আমিই বলছি।"

"বলো।"

"প্রাণগোবিন্দবাবুর হুকুমে এ কাজ হয়নি।"

"সেটা আমরা জানি গোপাল। আগে জানতাম না, এখন জেনেছি। এবার বলো, কার হুকুম?"

গোপাল হাল ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ হাউহাউ করে

কাঁদতে লাগল। লোক দু'টো ব্যস্ত হল না। স্থির হয়ে বসে রইল বেঞ্চিতে।

বেশ কিছুটা বাদে গোপাল সামলে উঠল। ধুতির খুঁটে চোখ মুছল। তারপর ধরা গলায় বলল, "তাঁর কাছে আমার টিকি বাঁধা। আমার জমিজিরেত, ব্যবসার মূলধন সব তাঁর কাছে বাঁধা। যদি বলি, তা হলে আমি শেষ হয়ে যাব।"

"তুমি না বললেও আমরা জানি। কিন্তু তবু আমরা তোমার মুখেই শুনতে চাই। বলো।"

"যদি জানোই তবে আর আমাকে দিয়ে বলাতে চাও কেন?"

"তার কারণ, আমরা যাচাই করে দেখতে চাই, আমরা যা আন্দাজ করেছি আর যা শুনেছি, তা সত্যি কিনা।"

গোপাল ধরা গলায় বলল, "পরশুদিনই বটুকবাবু আমাকে কাজটা করতে বলেন। কেন কোন কাজ করতে হবে তা জানতে চাওয়ার উপায় নেই। বটুকবাবু এমনিতে চুপচাপ, কিন্তু সামান্য বেয়াদপি দেখলে এমন সাংঘাতিক রেগে যান, যেন খুনও করতে পারেন। ভয়ে আমি কখনও কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারি না। তার উপর উনি আমার অন্নদাতা। অভাবে-কষ্টে যখন সংসার ভেসে যেতে বসেছিল, তখন উনি হাল না ধরলে এতদিনে মরেই যেতাম।"

"বটুকবাবুর রাগ কেমন?"

"অতি সাংঘাতিক। যখন রেগে ওঠেন, তখন চোখ-মুখের চেহারাই পালটে যায়। চোখে যেন বাঘের দৃষ্টি।"

"একটা কথা। উনি যখন গোরুটা প্রাণগোবিন্দবাবুর গোয়ালে রেখে আসতে বললেন, আর প্রাণগোবিন্দবাবুর কাছে মুক্তিপণের টাকা পৌঁছে দিতে বললেন, তখন তোমার খটকা লাগেনি?"

"লেগেছিল। কিন্তু খুব বেশি তলিয়ে ভাবিনি। একবার মনে হল, প্রাণগোবিন্দবাবুর সঙ্গে ওঁর বোধ হয় কোনও বন্দোবস্ত হয়েছে। শত হলেও উনি একসময় প্রাণগোবিন্দবাবুর ছাত্র ছিলেন, হয়তো তখন থেকেই ভাবসাব। আর তাই থেকেই এই বন্দোবস্ত।"

"উনি যে প্রাণগোবিন্দ রায়ের ছাত্র ছিলেন, তা কী করে জানলে?"

"প্রাণগোবিন্দ রায় যখন রিটায়ার করে দেশের বাড়িতে থাকতে এলেন, তখন খবরটা শুনে একদিন বটুকবাবু বলেছিলেন, মাস্টারমশাই তা হলে এলেন! ভালই হল।"

"তা হলে তোমার তেমন খটকা লাগেনি?"

"না।"

"প্রাণগোবিন্দবাবুর বাড়িতে কি ওঁর যাতায়াত ছিল?"

"না। বটুকবাবু কোথাও যান না।"

"তা হলে প্রাণগোবিন্দবাবুর সঙ্গে ওঁর বন্দোবস্ত হয় কী করে?"

"বললাম তো, ওটা নেহাত একটা আন্দাজ।"

"বটুকবাবুর একটা ভয়ংকর কুকুর আছে, তাই না?"

"ও বাবা! খুনে কুকুর!"

"শোনো গোপাল, গোকুল বিশ্বাসের সঙ্গে গন্ডগোল করে আজ অবধি কারও সুবিধে হয়নি।"

"আজ্ঞে, গোকুলবাবুর সঙ্গে আমার তো কোনও গন্ডগোল নেই! জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ আহাম্মক ছাড়া কেউ করে? আমরা যা করেছি তা প্রাণের দায়ে।"

"তা হলে বটুকবাবু এ কাজটা কেন করলেন বলে তোমার মনে হয়?"

"তা কী করে বলব। বড়-বড় মানুষের কত খেয়াল থাকে।"

"তাতে কী হল তা জানো? প্রাণগোবিন্দবাবুর মতো একজন মানী লোকের গায়ে গোরুচোরের ছাপ্পা মেরে দেওয়া হল। লোকে জানল, উনি একজন মস্ত লেখাপড়া জানা লোক হয়েও এমন জঘন্য কাজ করে টাকা উপায় করেন। লোকটা যে এমন কাজ করতে পারেন না, তা গাঁয়ের লোক বিশ্বাস করবে না। তারা গুজবে বিশ্বাসী। এর ফলে প্রাণগোবিন্দবাবু আত্মঘাতী হওয়ারও চেষ্টা করেন।"

"আমি তো অত জানি না। আমাকে মাফ করে দাও ভাই। না খেতে পেয়ে মরলেও আর এমন কাজ করব না।"

"কাল সকালে গোকুলবাবুর সঙ্গে তোমার ছেলেকে নিয়ে যেও। যদি মাফ করার হয় তিনি করবেন। তোমরা লোকটাকে যত খারাপ বলে ধরে নিয়েছ, লোকটা কি তত খারাপ? গোকুল বিশ্বাস দশ-বারোটা ছেলের পড়ার খরচ দেয়। একটা অনাথ আশ্রম চালায়। এসব কি খারাপ লোকের লক্ষণ?"

"নাক মলছি, কান মলছি ভাই। গোকুলবাবুকে আমরা খারাপ ভাবি না, বিশ্বাস করো।"

লোক দু'টো তার দিকে একবার বিষদৃষ্টি হেনে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। দোকানের গদিতে অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইল গোপাল। মনে বড় দুশ্চিন্তা, এবার কি রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হবে, আর উলুখাগড়ার প্রাণ যাবে?

একটা দিক রক্ষা হল বটে কিন্তু আর-এক দিকে যে বিপদ ঘনিয়ে এল! গোকুল বিশ্বাস যদি বা ছেড়েও দেয়, বটুকবাবু আর রক্ষে রাখবেন কি? সে ভালই জানে, গোকুলের চেয়ে বটুক কম ভয়ংকর নন, বরং আরও বেশি। গোকুলের ওস্তাদের কাছে তিনি যেসব কথা কবুল করেছেন, সেটাও চাপা যাবে না।"

জীবনে প্রথম গাছে ওঠার পর প্রাণগোবিন্দ বুঝতে পারছেন, আজ তাঁর জীবনটাই যেন পালটে গিয়েছে। কোথায় গলায় দড়ি দিয়ে মরবেন, না তার বদলে বৃক্ষবাসী বাদামচন্দ্র ঘোষের মতো একজন বিজ্ঞ বন্ধু পেয়ে গেলেন। সত্যি কথা বলতে কী, গাছে উঠলে শুধু জ্ঞানই বাড়ে না, বুকে ফুর্তির ভাবটাও উথলে ওঠে। আজ সেই ফুর্তিতেই প্রায় তুড়ি দিয়ে চলেছেন প্রাণগোবিন্দ। ময়নার জঙ্গলে গাছে উঠে তাঁর এমন ডগমগভাব হল যে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার পরও গাছ থেকে মোটেই নামতে চাইছিলেন না। শেষ অবধি বাদাম ঘোষের চাপাচাপিতেই নামতে হল। বাদাম ঘোষ বলল, "বাপু হে, গাছে থাকার মজাই আলাদা। কিন্তু কী জানো, জ্ঞানের পোঁটলা নিয়ে বসে থাকলেই তো হবে না, সেটাকে কাজে লাগানোও তো দরকার। যে গন্ডগোলটা পাকিয়ে রেখে এসেছ, তার গিঁট না খুললেই নয়।"

প্রাণগোবিন্দর অবশ্য মনে হচ্ছিল, এখন দুনিয়াও রসাতলে গেলেই বা তাঁর কী! তিনি তো থাকবেন গাছে, দুনিয়া ভেসে যায় যাক, তবে অত আনন্দের মধ্যেও খিদে-তেষ্টা বলেও যে একটা ব্যাপার আছে, সেটা মাঝে-মাঝে টের পাচ্ছিলেন, আর ফাঁকে-ফাঁকে নাতি-নাতনি পিউ আর পিয়ালের কথাও বড্ড মনে পড়ছিল। তাই বাদাম ঘোষের চাপাচাপিতে শেষ অবধি পড়ন্ত বেলায় গাছ থেকে দু'জনে নামলেন। টের পাচ্ছিলেন তাঁর মাথাটা জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তিতে একেবারে টইটুম্বুর হয়ে আছে। রোজকার আলাভোলা, বোকাসোকা প্রাণগোবিন্দ যেন আর নেই, এ এক নতুন প্রাণবন্ত প্রাণগোবিন্দ। জ্ঞানবৃক্ষ কথাটার মানে আজ তিনি স্পষ্ট বুঝলেন।

তারপর দুই জ্ঞানবৃদ্ধ বীরদর্পে হেঁটে লহমায় পৌঁছে গেলেন চরণডাঙা গাঁয়ে। এ গাঁয়েই ভয়ংকর গোকুল বিশ্বাসের বাস, কিন্তু প্রাণগোবিন্দর কোথাও উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নেই। জীবনে কখনও সঙ্গীতচর্চা করেননি প্রাণগোবিন্দ, কিন্তু আজ গুনগুন করে একটু রামপ্রসাদী গাইতে লাগলেন। তেমন বেসুরো গাইছেন বলেও মনে হল না তাঁর।

হুট বলতে গোকুল বিশ্বাসের বাড়িতে ঢোকা আর সিংহের গুহায় মাথা গলানো একই ব্যাপার। সেখানে গদাম-গদাম চেহারার আর ফটফটে চোখওলা দন্ত কিড়মিড় করা আসুরিক লোকজন পাহারা দিচ্ছে। মাছি অবধি গলবার উপায় নেই, কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার! দু'ই জ্ঞানবৃদ্ধকে দেখে অসুরদের যেন দাঁত-নখ সব খসে পড়ল, তারা বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে পথ ছেড়ে দিল।

প্রভঞ্জন সূত্রধর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বোধ হয় আসছিলেন। প্রাণগোবিন্দকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, "বাপ রে! এ যে

বিচক্ষণ প্রাণগোবিন্দবাবু! তা কী চাই বলুন তো? আরও পাঁচ-দশ হাজার টাকা নাকি? না, না, লজ্জা পাবেন না। পঞ্চাশ হাজার যদি একটু কম হয়েছে বলেই মনে হয়ে থাকে তা হলে পরিষ্কার করে বলুন, মিটিয়ে দেওয়া হবে।"

অন্য দিন হলে প্রাণগোবিন্দ হয়তো এ কথা শুনে রেগে যেতেন বা দুঃখে কেঁদেই ফেলতেন। কিন্তু আজ তিনি অন্য প্রাণগোবিন্দ, শান্ত মাথায় তিনি তখন সব কথা বলে যেতে লাগলেন, অর্থাৎ তাঁর মুখ দিয়ে অন্য এক অচেনা জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাণগোবিন্দ এমন সব কথা প্রম্পট করতে লাগলেন যে, প্রভঞ্জন ভারী কাঁচুমাচু হয়ে জিভ কেটে মাথা নিচু করে পালানোর পথ পান না।

গোকুল বিশ্বাসের হাতে বন্দুক বা পিস্তল ছিল না। কিন্তু যে কেউ গোকুল বিশ্বাসের চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারে যে, এ মানুষের আলাদা বন্দুকের দরকার নেই। গোকুলের দু'খানা বাঘা চোখই যেন দোনলা বন্দুক। সেই চোখ থেকে যেন সর্বদাই গুলি বেরিয়ে এসে চারদিক ছ্যাঁদা করে দিচ্ছে। শালখুঁটির মতো দু'খানা হাত। ওই হাতে মোষের ঘাড় মটকানো আর গামছা নিঙড়ানো প্রায় একই রকম সহজ। তা এহেন গোকুল বিশ্বাসের সামনে গিয়ে যখন দু'ই জ্ঞানবৃদ্ধ দাঁড়ালেন, তখন গোকুলকে কে যেন ইলেকট্রিক শক দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। সে ভারী জড়সড় হয়ে হাতজোড় করে বলতে লাগল,"কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! আস্তাজ্ঞে হোক! বস্তাজ্ঞে হোক।"

প্রাণগোবিন্দ ভারী ফুর্তি বোধ করছেন। মাথাটা যে কী চমৎকার কাজ করছে তা কহতব্য নয়। তিনি অতিশয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে নাতিদীর্ঘ ভাষণটি দিলেন, তাতে গোরুচুরি থেকে গোটা ব্যাপারটাই এত করুণ আবেদনের সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, গোকুল বিশ্বাসের বাঘা চোখও ছলছল করতে লাগল। গোকুল বিশ্বাস ধরা গলায় বলল, "আমাকে মাফ করবেন প্রাণগোবিন্দবাবু। আমি বড্ড ভুল করে ফেলেছি। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব। আপনি ভাববেন না।"

না, প্রাণগোবিন্দর আর ভাবনাচিন্তা, উদ্বেগ, হীনমন্যতা কিছুই নেই। গোকুলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বলে উঠলেন, "চমৎকার! অতি চমৎকার!"

বাদাম ঘোষও তারিফ করে বলল, "তোমার দিব্যি উন্নতি হচ্ছে হে!"

দাড়ি-গোঁফওয়ালা, আলখাল্লা পরা একটা লোক হঠাৎ তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভারী অবাক হয়ে প্রাণগোবিন্দর দিকে চেয়ে রইল। তারপর ভারী বিনয়ের সঙ্গে হাতজোড় করে বলল, "কর্তাবাবু, আপনি যে একেবারে পালটি খেয়ে গেছেন! চেনাই যাচ্ছে না!"

প্রাণগোবিন্দ গোরাং দাসের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ওরে গোরাং, আমি আর সেই আগের কর্তাবাবু নেই রে। নিজেকে আমি নিজেই চিনতে পারছি না।"

গোরাং মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "তা হলে যে ভারী মুশকিল হবে কর্তাবাবু! বড্ড ভজঘট লেগে যাবে যে! আপনাকে যারা এতকাল মাপজোপ করে একটা আঁচ করে রেখেছিল, তাদের সব হিসেবনিকেশ উলটে যাবে না তো!"

"সেসব জানি না রে গোরাং। শুধু বলতে ইচ্ছে করছে 'আজকে আমার মনের মাঝে ধাঁইধপাধপ তবলা বাজে।' "

গোরাং একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, বোলটা খুব ফুটেছে কর্তা। মনে হচ্ছে আমিও যেন শুনতে পাচ্ছি। তা কর্তা, গুরুতর একটা কথা ছিল।"

দু'ই জ্ঞানবৃদ্ধ গোরাংয়ের সব কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন। সেই ম্যাজিশিয়ানের কথা, চকোলেট, রহস্যময় চিরকুট, শেষের বটুক সামন্তের কুকুর আর টক্কেশ্বরের অভিজ্ঞতার কথাও।

শুনে বাদাম ঘোষ বলল, "কিছু বুঝলে হে প্রাণগোবিন্দ?"

প্রাণগোবিন্দ একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "জলের মতো।"

"কী বুঝলে?"

"ম্যাজিশিয়ানটা জালি। আর যেই হোক, লোকটা বিক্রমজিৎ নয়।"

মাথা নেড়ে বাদাম ঘোষ বলে, "আমারও তাই মনে হয়েছে।"

একটু চিন্তিত মুখে প্রাণগোবিন্দ বললেন, "আমার গিন্নি বলেন, আমার নাকি বড্ড ভুলো মন। একমাত্র দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই আমার মনে থাকে না। তা কথাটা মিথ্যেও নয়। বাজার থেকে সাতটা জিনিস আনতে দিলে আমি দু'টো ঠিক জিনিস, বাকিগুলো ভুল জিনিস নিয়ে আসি। কারও নামটাও আমার মনে থাকে না, রামকে রাবণ, হারাধনকে বিশ্বজিৎ বলে আকছার ভুল বলছি। কিন্তু আজ আর ভুল হওয়ার জো নেই। মাথা পরিষ্কার কাজ করছে, স্পষ্ট মনে পড়ছে, আজ থেকে বাইশ বছর আগে বটুক সামন্ত নামে আমার এক বেয়াদব ছাত্র ছিল। অত্যন্ত রগচটা, মারমুখো ছেলে। দুমদাম রেগে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মারপিট করত। একবার সে তার এক ক্লাসমেটকে সামান্য কারণে এমন মেরেছিল যে, ছেলেটাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। আমি তখন কলেজের প্রিন্সিপাল, বাধ্য হয়ে তাকে কলেজ থেকে তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিই। তাতে রেগে গিয়ে সে রাত্রিবেলা কলেজ বিল্ডিংয়ে আগুন দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে তাকে রাস্টিকেট করতে হয়। জানি না এই সেই বটুক সামন্ত কিনা! তবে সেও ম্যাজিক দেখাত বলে শুনেছিলাম।"

গোরাং ভারী মুগ্ধ চোখে প্রাণগোবিন্দর দিকে চেয়ে বলল, "বড্ড গোলমালে ফেলে দিলেন কর্তাবাবু! আলাভোলা মানুষটি ছিলেন, কতবার এক টাকার জায়গায় ভুল করে পাঁচ টাকা দিয়ে ফেলতেন। হাটেবাজারে দশ টাকার জিনিস বিশ টাকায় কিনে আনতেন। চোর—বাটপাড়েরা কত কম মেহনতে আপনার পকেট থেকে টাকাপয়সা হাপিশ করতে পারত। আমরা তো ধন্যি-ধন্যি করতাম, কিন্তু আপনি হুঁশিয়ার হয়ে ওঠায় সে চিন্তার লোক ভারী লোকসানে পড়ে যাবে। গিন্নিমার কথাটাও একটু ভাবুন।"

শশব্যস্ত প্রাণগোবিন্দ বললেন, "কেন, তাঁর আবার কী হল?"

"তিনি যে বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন কর্তাবাবু। এতকাল একজন ভারী আত্মভোলা, আনমনা, কাছাছাড়া মানুষের ঘর করে বুড়ো হলেন। এখন যে তাঁকে একজন ভারী চালাক-চতুর, হুঁশিয়ার, হিসেবি লোকের সঙ্গে নতুন করে ঘর করতে হবে। এটা ভেবে দেখেছেন? এই কেঁচে গণ্ডুষে তাঁর যে ভারী হয়রানি হবে!"

বাদাম ঘোষ মাথা নেড়ে বলল, "খুব ঠিক কথা হে প্রাণগোবিন্দ! আমি বৃক্ষবাসী হওয়ার পর থেকেই আমার বাড়িতেও এরকম সব হয়েছিল কিনা। গিন্নি লুকিয়ে গয়না গড়ালে টের পেতুম, রাখাল ছেলেটা গোরুর দুধ চুরি করলে ধরে ফেলতুম, নাতি পড়ায় ফাঁকি দিয়ে ডান্ডাগুলি খেলছে কিনা বলে দিতে পারতুম।"

প্রাণগোবিন্দ বুক ফুলিয়ে বললেন, "আমার সঙ্গে আর কেউ চালাকি করে পার পাবে না। এই তো সেদিন, গিন্নি ছাদে বড়ি শুকোতে দিয়ে আমাকে পাহারায় বসিয়ে রেখেছিলেন। কী বলব মশাই, একটা জিনিস ভাবতে-ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, ওমনি কাকগুলো এসে বড়ির টুকরো ছড়িয়ে ছয়ছত্রখান করে গেল। গিন্নি এসে কী উত্তম-কুত্তম করে অপমান করলেন আমায়। তারপর ধরুন, বাজারের রাধেশ্যাম মুদি, যখনই কিছু কিনতে যাই, তখনই রাধেশ্যাম এসে আমার সামনে দাঁড়ায়, বিগলিত মুখে নানা গল্প ফেঁদে বসে আর এমনভাবে দাঁড়িপাল্লাটা আড়াল করে দাঁড়ায়, যাতে আমি দেখতে না পাই। প্রত্যেকদিন ওজনে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে! মানুষের কথা কী আর বলব, আমার বিড়াল দু'টো কী কম বজ্জাত! তাদের এমন চায়ের নেশা হয়েছে যে, আমি খবরের কাগজে মুখ ঢাকলেই তারা লাফিয়ে টেবিলে উঠে আমার চায়ের কাপ থেকে চুকচুক করে চা খেয়ে নেয়। সব সময় তো আর বুঝতে পারি না, তাই সেই বিড়ালের এঁটো করা চা-ও কতদিন খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু সেসব দিন আজ ইতিহাস। যাক, বিড়াল আর রাধেশ্যাম কেউ এখন আমার হাতে নিস্তার পাবে না।"

গোরাং দাস বিনীতভাবেই বলল, "বুঝতে পারছি, আমাদের

কপালেই এবার কষ্ট আছে।"

প্রাণগোবিন্দ এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "কিন্তু ঘটনার প্যাটার্নটা এখনও ঠিক ধরা যাচ্ছে না! ম্যাজিশিয়ান, চকোলেট, চিরকুট, বটুক, তাঁর কুকুর আর পুতুলের উপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া, এসব কি এক সূত্রে বাঁধা! নাকি আলাদা-আলাদা বিচ্ছিন্ন ঘটনা!"

বাদাম ঘোষ বলল, "একটু চেপে ভাবলেই বেরিয়ে আসবে। তোমার মাথা তো এখন চমৎকার কাজ করছে হে!"

"তা করছে। কিন্তু এখনও আমি জানি না, কে বা কারা গোকুল বিশ্বাসের গোরুটা চুরি করে আমার গোয়ালে রেখে এল এবং কে-ই বা মুক্তিপণের টাকা আমার কাছে পৌঁছে দিতে বলল। মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে, এসব ঘটনা একই সূত্রে বাঁধা।"

গোরাং চাপা গলায় বলল, "গাঁয়ে আপনার বদনামও করেছে লোকে।"

লোকের আর দোষ কী বলো? আমার গিন্নিও তো আমাকে গোরুচোর বলে সন্দেহ করলেন!"

॥৭॥

পিউ একটা কাঠের পুতুল কিনল। ঘাড় ধরে ঘোরালেই মুন্ডুটা খুলে যায়, ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে আর-একটা পুতুল। আবার সেটার পেটের মধ্যেও আবার একটা পুতুল। আর-একটা কাচের চুড়িওয়ালা তার দু'হাতে কী সুন্দর সব জরি বসানো কাচের চুড়ি পরিয়ে দিল। একটুও ব্যথা লাগল না। কাঠের চিরুনি সে কখনও দ্যাখেনি। দু'টো নিল। একটা মাকে দেবে। পিয়ালের জন্য নিল বাঁশি আর বেলুন আর প্লাস্টিকের ব্যাট-বল। দাদু আর ঠাকুরমার জন্য কিছু একটা নেওয়া উচিত। কী নেবে ভাবছিল। এমন সময় দেখতে পেল, মেলার গেটের দিকে একটা ভারী সুন্দর রঙিন তাঁবু। তার বাইরে লাল শালুর উপর সাদা অক্ষরে লেখা: *বিক্রমজিতের ম্যাজিক শো!*

সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই তো বিক্রমজিতের ম্যাজিক!"

হলধর উঁচু হয়ে বসে সুরবালার ফরমাশ অনুযায়ী ভারী লোহার চাটুর দরদাম করছিল। বলল, "ম্যাজিক দেখতে গেলে দেরি হয়ে যাবে দিদি! সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।"

"আমি যে বিক্রমজিতকে চিনি! ভীষণ ভাল ম্যাজিক দেখায়। সে আমাকে চকোলেট দিয়েছিল।"

"এই তো মুশকিলে ফেললে দিদি! দেরি হয়ে গেলে আমি বকুনি খাব!"

"বাঃ রে! আমরা তো এখনও দাদুকেই খুঁজে পাইনি! ঘুড়ির মধ্যে যে লেখাছিল দাদু এই মেলাতেই আছেন।"

হলধর ফাঁপড়ে পড়ে বলল, "বুড়ো মানুষরা কি আর মেলায় ঘুরে বেড়ান! দ্যাখো গে যাও, দাদু এতক্ষণে বাড়ি ফিরে বসে চা খাচ্ছেন!"

"তুমি কী করে জানলে?"

একগাল হেসে হলধর বলে, "তা আর জানব না! এসময় চা না খেলে যে কর্তাবাবু তেড়ে ইংরিজি বলেন! আমার সঙ্গে একদিনে এমন ইংরিজি বলেছিলেন যে, রাতে আমার মোটে ঘুমই হল না, আর মোক্ষদা তো ইংরিজি বকুনির চোটে হাউমাউ করে কী কান্নাই কাঁদল। তখন কর্তামা তাড়াতাড়ি চা করে দেওয়ার পর চা খেয়ে তবে কর্তাবাবু বাংলায় নামলেন।"

"যাঃ, দাদু মোটেও ওরকম নন। আচ্ছা হলধরদাদা, ওই ট্যারা লোকটাকে লক্ষ করেছ?"

"ট্যারা লোক! না তো! কার কথা বলছ?"

"আমরা যখন নসিগঞ্জে ভ্যানে উঠছি, তখন বাজারের কাছ থেকে লোকটা খুব লক্ষ করছিল আমাদের। এখন দেখছি মেলাতেও লোকটা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে।"

হলধর বলল, "তোমার রাঙা টুকটুকে জামাটা দেখেছে বোধ হয়, গাঁয়ের গরিব লোক তো সব, এত সুন্দর পোশাক তো বড় একটা দ্যাখে না।"

"না হলধরদা, আমি তাকালে লোকটা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ছে।"

"ভয় পেও না দিদি, আমি তো সঙ্গেই আছি।"

"আমি মোটেই ভয় পাইনি।"

"ট্যারা লোকটা কাকে দেখছে তা তো বোঝবার উপায় নেই কিনা। তারা কাকের দিকে তাকিয়ে হয়তো বক দেখতে পায়। রামবাবুর দিকে চেয়ে শ্যামবাবুর সঙ্গে কথা কয়।"

ঠিক এই সময় জোকারের পোশাক পরা একটা লোক এগিয়ে এসে পিউকে বলল, "ম্যাজিক দেখবে না খুকি? বিক্রমজিতের ম্যাজিক? এই নাও দু'টো টিকিট। ম্যাজিক এক্ষুনি শুরু হবে।"

বলেই লোকটা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিউ হাতের দু'খানা টিকিটের দিকে চেয়ে বলল, "দেখলে তো হলধরদাদা, বিক্রমজিৎ কেমন ভাল!"

হলধর আমতা-আমতা করে বলল, "তাই তো দিদি, বিক্রমজিৎ তো তোমার চেনা লোকই দেখছি। তা, দেরি একটু হলে হোক। বিনে পয়সায় বরং ম্যাজিকটা একটু দেখেই যাই চলো।"

দু'জনে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকে ভারী অবাক হয়ে গেল। সারি-সারি চেয়ার সাজানো আছে বটে, কিন্তু একটাও লোক নেই। তাঁবু একদম ফাঁকা। সামনে ছোট একটা স্টেজ। পরদা ফেলা। তারা বসতে না-বসতেই পরদা সরে গেল। বিক্রমজিৎ স্টেজে এসে দাঁড়াল। ঠিক সকালে যেমন দেখেছিল, তেমনই কালো কোট আর প্যান্ট, লাল টাই, মাথায় টুপি। বিক্রমজিৎ ম্যাজিক দেখাতে শুরু করে দিল।

হলধর চাপা গলায় বলে, "ইরে বাবা, কত চটপট দেখাচ্ছে! এত তাড়াহুড়োর কী আছে বলো তো!"

কথাটা সত্যি। বিক্রমজিৎ বড় তাড়াতাড়ি ম্যাজিক দেখাচ্ছে। মুখে কোনও কথা নেই। টুপি থেকে বের করছে কাচের গ্লাস, ফুলদানি, জ্যান্ত সাপ, খরগোশ, পায়রা। তারপর হঠাৎ একটা লাল চাদর দু'হাতে ধরে উঁচু করে নিজেকে আড়াল করল বিক্রমজিৎ। চাদরটা দু'-একবার দুলে উঠেই পড়ে গেল নীচে। দেখা গেল বিক্রমজিৎ চাদরের আড়ালে নেই, কোথাও নেই। কিন্তু হঠাৎ একটা চাপা শিসের শব্দ হল যেন। আর তারপরই স্টেজের উপরে উঠে এল একটা ভয়ংকর সাদা কুকুর। মাত্র একবার একটা 'আউফ' শব্দ করে সেটা স্টেজ থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমেই সোজা ছুটে এল তাদের দিকে।

পিউ আর হলধর কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুকুরটা সোজা এসে লাফিয়ে পড়ল তাদের উপর। দু'জনেই চেয়ার উলটে পড়ে গেল মাটিতে। ঠিক এই সময় আর-একটা তীব্র শিসের শব্দ হল। পিউ চিৎকার করে উঠল, "মা গো!"

চোখ বুজে ফেলেছিল পিউ। এত ভয় সে কখনও পায়নি। ভয়ে শক্ত হয়ে পড়ে রইল সে। কুকুরটা কি কামড়াবে তাকে? কেন কামড়াবে? সে তো কিছু করেনি!

কারা যেন এসে দাঁড়াল কাছে। কে একজন তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বলল, "ভয় নেই মা। কোনও ভয় নেই।"

পিউ চোখ চেয়ে অবাক হয়ে দেখল, কয়েকজন লোক তাদের চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন গোরংদাদা, আর দাদু।

"দাদু," বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিউ।

দাদু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কোনও ভয় নেই ভাই, কোনও ভয় নেই।"

"কুকুরটা যে আমাকে কামড়ে দিচ্ছিল!"

"হ্যাঁ, কপাল ভাল, তাই অল্পের জন্য বেঁচে গেছ। এই যে ছেলেটাকে দেখছ, এ হল টক্কেশ্বর। এ-ই বুদ্ধি করে শিসটা ঠিক সময়ে দিয়েছিল। আর তাইতেই কুকুরটা ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে যায়। নইলে এতক্ষণে কী হত, ভাবাই যায় না।"

"কুকুরটা কেন আমাকে কামড়ে দিচ্ছিল দাদু! আমি তো কিছু করিনি!"

"না, তুমি কিছু করোনি। কিন্তু বাইশ বছর আগে তোমার দাদু কিছু করেছিল। আর এটা তারই প্রতিশোধ।"

গোকুল বিশ্বাস আর তার কয়েকজন শাগরেদ বাদাম ঘোষ, গোরাং দাস, টক্কেশ্বর—সবাই এসে প্রাণগোবিন্দবাবুকে ঘিরে বসে গেল। গোকুল বলল, "ব্যাপারটা আমার মাথায় এখনও সেঁধোয়নি। একটু বুঝিয়ে বলুন।"

প্রাণগোবিন্দ ব্যথিত মুখে বললেন, "এ বড় সুখের গল্প নয়। বাইশ বছর ধরে যে কেউ এত রাগ পুষে রাখতে পারে, তার ধারণাও আমার ছিল না। বটুককে রাস্টিকেট করার যে এতখানি মূল্য দিতে হবে, তাও জানা ছিল না। সে আমাকে একেবারে শেষ করে দিতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু খুব ধীরে-ধীরে, দগ্ধে-দগ্ধে। সরাসরি মেরে দিলে আর মজা কী? তাই সে গোকুলের গোরু চুরি করে আমার গোয়ালে চালান দেওয়া আর মুক্তিপণ আমাকে দেওয়ানোর ব্যবস্থা করে। সে ভালই জানে, এই গ্রামদেশে একবার কলঙ্ক আর বদনাম হলে সহজে তা স্খলন হয় না, আর গাঁয়ের লোকরা এসব জিনিস সহজেই বিশ্বাস করে। কাজেই আমাকে গোরুচোর এবং মুক্তিপণ আদায়কারী এক জঘন্য লোক বলে সে দেগে দিতে চেয়েছিল, তাতে চরিত্রহনন যেমন হবে, তেমনই আমার হবে বুদ্ধিনাশ। শুধু এটুকু করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, তার ভিতরে বাইশ বছর ধরে যে কত রাগ পুষে রেখেছে, তার আরও ভয়ংকর প্রতিশোধ চাইছিল। আর এর জন্যই সে বেছে নেয় আমার নাতনিকে। আমার এই আদরের নাতনিকে খুন করলে আমি বেঁচে থেকে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পাব, এটা সে ভালই জানে। এজন্য সে বুদ্ধি করে ম্যাজিশিয়ান সেজে বাসের মধ্যে খেলা দেখায়, আর আমার নাতনি তার বেশ ভক্ত হয়ে পড়ে। নানা কৌশলে সে পিউকে টেনে আনে এই মেলায়। প্ল্যান সে ভালই করেছিল। নির্জন তাঁবুর মধ্যে কুকুর দিয়ে বাচ্চা মেয়েটাকে খুন করলে পুলিশ তাকে ধরতেও পারত না। গ্রামদেশের পুলিশ অত তৎপর নয়। তার উপর সাক্ষিসাবুদও নেই।"

টক্কেশ্বর বলল, "বটুকবাবুর কুকুরটার রং কিন্তু কালো।"

প্রাণগোবিন্দ বললেন, "হ্যাঁ, কুকুরটাকে কামোফ্লাজ করার জন্য সেটার গায়ে সাদা রং লাগিয়ে নিয়েছিল সে। আমরা খবর নিয়েছি, এ-তাঁবুতে বিক্রমজিতের ম্যাজিক শো হয় না, হয় পুতুলনাচ। আর সেটা হয় দুপুরে। বাইরে যে লাল শালু টাঙানো আছে, সেটা শুধু আমার নাতনিকে টেনে আনার জন্যই।

গোকুল বিশ্বাস বলে, "কিন্তু কুকুরটা সবাইকে ছেড়ে আপনার নাতনির দিকেই বা তেড়ে এল কেন?"

"এখানেও গোকুলের ক্ষুরধার বুদ্ধির কথা বলতে হয়। সকালে বাসের মধ্যে সে আমার নাতি আর নাতনিকে চকোলেট-বার দিয়েছিল। আমার দৃঢ় ধারণা, পিউকে দেওয়া চকোলেটটার মধ্যে এমন কিছু সে মাখিয়ে দিয়েছিল, যার গন্ধ পিউয়ের শরীরে থেকে যাবে। মানুষের নাক সে গন্ধ টের পাবে না বটে, কিন্তু কুকুরের জ্ঞানেন্দ্রিয় অনেক তীক্ষ্ণ। আমার আরও মনে হয়, যে মেয়েপুতুল দিয়ে সে কুকুরটাকে ট্রেনিং দিচ্ছিল, সেটার গায়েও ওই গন্ধ মাখানো আছে। পিউ যদি আজ মেলায় না-ও আসত, তা হলেও ছাড়ত না বটুক। পিউকে যেখানে পেত, সেখানেই সে তার কামোফ্লাজ করা খুনে কুকুর লেলিয়ে দিত।"

গোকুল বিশ্বাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "প্রাণগোবিন্দবাবু, কবুল করছি আমিও এক সময় পাজি লোক ছিলুম বটে, কিন্তু এত শয়তানি বুদ্ধি আমারও ছিল না।"

"যেসব খারাপ লোক বুদ্ধিমান হয় তারাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। তার প্ল্যানিং দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। টুকরোটাকরা ঘটনাগুলোকে সাজাতে গিয়ে ধরা পড়ল, যা সব ঘটেছে তা একটা সুতোয় বাঁধা। এই সাজাতে গিয়ে বড্ড দেরি হয়ে গেল। একেবারে শেষ সময় পিউকে বাঁচানো গেছে, তাই ঢের। টক্কেশ্বর রোজ বটুকের বাড়ির দেওয়ালে উঠে সব লক্ষ করত। কোন শিস দিলে কুকুরটা তেড়ে যায়, কোন শিসে ফিরে আসে, তা শিখে গিয়েছিল। ওর শিসটা ঠিকমতো কাজ না করলে অবশ্য আপনাকে গুলি চালাতেই হত গোকুলবাবু। তবে তাতে পিউয়ের রিস্ক ছিল।"

গোকুল বিশ্বাস মাথা নেড়ে বলল, "না মশাই, না। আমার হাতের টিপ এখনও অব্যর্থ। এক চুল এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন।"

"রক্ষে করুন। পরীক্ষার দরকার নেই। তবে কুকুরটাকে যে মারতে হয়নি, এটাতে আমি স্বস্তিই বোধ করছি।"

পিউ দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "দাদু, বিক্রমজিৎ কি খারাপ লোক? আমার যে তাকে খুব ভাল লাগে! কী সুন্দর ম্যাজিক দেখায়!"

"হ্যাঁ দিদিভাই। তার গুণও অনেক। ওই বুদ্ধি কাজে লাগালে সে অনেক ভাল কাজও করতে পারত। কিন্তু অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা। বাপ-ঠাকুরদার অঢেল পয়সা পেয়ে সে কর্মবিমুখ হয়ে গিয়েছিল, আর তার চণ্ড রাগও ছিল তার বড় শত্রু।"

ঠিক এই সময় তাঁবুর পরদা সরিয়ে দারোগাবাবু এসে ঢুকলেন। প্রাণগোবিন্দবাবুকে প্রণাম করে বললেন, "সরি মামাবাবু, কুকুরটাকে গুলি করে মারতে হয়েছে। কিছু করার ছিল না। বটুককে অ্যারেস্ট করার সময় কুকুরটা ভীষণ ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে। কুকুরটাকে মারতেই বটুকবাবু কোলাপস করেন।"

প্রাণগোবিন্দ বললেন, "খুবই দুঃখের কথা, কুকুরটাকে সে খুবই ভালবাসত, যেমন ওই গোকুল বিশ্বাস তার গোরুটাকে ভালবাসে, যেমন আমি আমার এই নাতনিটাকে ভালবাসি। এসব ভালবাসার গল্পের সঙ্গে যখন ঘৃণা-বিদ্বেষ এসে মিশে যায়, তখনই হয় বিপত্তি। নইলে ভালবাসার মতো এমন শুদ্ধ জিনিস আর কী আছে বলো!"

দারোগা সুধাবিন্দু বললেন, "তা বটে।"

সকালবেলা সুরবালা খুবই চেঁচামেচি করছিলেন, "ও পিউ, এ কাকে দাদু বলে ধরে নিয়ে এলি ভাই? সেই আলাভোলা ভালমানুষ লোক তো এ মোটেই নয়। এই ধুরন্ধর লোকটা তোর দাদু হয় কী করে, অ্যাঁ?"

পিউ খিলখিল করে হেসে বলে, "ইনিই তো আমার দাদু!"

তা হলে বলতেই হবে, ওই বৃক্ষবাসী বাদামচন্দ্র ঘোষের পাল্লায় পড়ে তোর দাদু একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। আগে চায়ে চিনি কম-বেশি হলে টের পেত না। বাজারে গেলে হিসেব মেলাতে পারত না। সংসারের কোনও খবরই রাখত না। কিন্তু এখন তো দেখি কেবল টিকটিক করছে, এটা হল না কেন, ওটা হল কেন? এক রাত্তিরেই আমার হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। এখন এই নতুন লোককে সামলাব কী করে বল তো!"

উঠোনের কোণে বসে হলধর খড় কাটছিল। মুখ তুলে বলল, "যা বলেছেন মাঠান। আগে কত্তাবাবুর চোখ দুটো ছিল গোরুর চোখের মতো ঠান্ডা। এখন একেবারে টর্চবাতির মতো জ্বলতে লেগেছে।"

বাইরের বারান্দার সিঁড়িতে বসে গোরাং দাস মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "বলেছিলাম না কত্তাবাবু, বড় ভজঘট বেধে উঠবে! আমাদের যে সব হিসেবনিকেশ উলটে গেল!"

প্রাণগোবিন্দ মৃদু-মৃদু হেসে আপনমনে শুধু বললেন, "হুঁ, হুঁ বাবা!"